ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১, আষাঢ় ১৪০৮

সংবাদপত্রে ২০০০ সালের পরীক্ষা ভাবনা ঃ একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ হান্নান *

The Public Examinations of 2000 as Reflected in Newspapers : A Review

- Mohammed Hannan Ph.D

Abstract : The evaluation process of academic attainment in education system of Bangladesh is faulty. There is rampant scope of copying in it. There is also social resistance against it. Every year the newspapers heading the propensity of copying. But the point of socio administrative resistance is conspicuously absent in the newspapers. This article has consulted 20 top national dailies and one weekly for research in the face of the public examinations of the year 2000. The newspapers tend to exaggerate the propensity of copying in a lot of examination centers. But it is also true that tendency of copying is every low in many center. The newspapers do not highlight news on that. If they ever do that insignificantly and allocate a very small space in the inner pages. A study of newspaper reports on the public examinations shows different sorts of information about involvement of the guardians and teachers in cheating in the examinations, weakness of the administration resisting, copying and also the stand of the court in this respect. Thus print media create a creative impression about the examination system in our country. Inspite of this, this sort of treatment by the newspaper has a positive impact which paves way for consolidating people's support socially against cheating in the examinations.

---

* সিনিয়র তথ্য অফিসার, পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন দিক এই পর্যালোচনা প্রতিবেদনে জাতীয় সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এতে কোন আঞ্চলিক সংবাদপত্র ব্যবহৃত হয়নি, মোট ২০টি জাতীয় সংবাদপত্র এবং একটি মাত্র জাতীয় সাপ্তাহিকের রিপোর্ট এই প্রতিবেদন তৈরীতে ব্যবহার করা হয়েছে।

জাতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে ছিল ঃ

১. বাংলাদেশ অবজারভার
২. ডেইলি ষ্টার
৩. নিউ নেশন
৪. দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট
৫. দৈনিক ইত্তেফাক
৬. দৈনিক জনকণ্ঠ
৭. সংবাদ
৮. ভোরের কাগজ
৯. আজকের কাগজ
১০. দৈনিক ইনকিলাব
১১. প্রথম আলো
১২. দৈনিক দিনকাল
১৩. দৈনিক মানব জমিন
১৪. দৈনিক খবর
১৫. মুক্তকণ্ঠ
১৬. বাংলাবাজর পত্রিকা
১৭. দৈনিক মাতৃভূমি
১৮. বাংলার বাণী
১৯. দৈনিক সংগ্রাম
২০. যুগান্তর এবং
২১. সাপ্তাহিক ২০০০।

২০০০ সালের এইচএসসি এবং আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা চলাকালীণ সংবাদপত্রগুলি থেকে পরীক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ এবং প্রকাশিত আলোকচিত্র এই প্রতিবেদনে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষা নিয়ে এসময় সংবাদপত্রে প্রচুর নিবন্ধ, চিঠিপত্র এবং অনেক সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়, এগুলিও পর্যালোচনাকালে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সংবাদপত্রে পরীক্ষা ভাবনা শিরোনামে রিপোর্টটি তৈরী করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পরীক্ষা সংক্রান্ত খবর পরিবেশনে সংবাদপত্রের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোর নিজস্ব পরীক্ষা প্রতিবেদনের সঙ্গে ঘটনার সত্যাসত্য নিরীক্ষণে সহায়তা করা।

২০০০ সালের এইচএসসি এবং আলিম, ফাজিল, কামিল পরীক্ষার্থী ও অন্যান্য তথ্যাবলী

শিক্ষা বোর্ডগুলো থেকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০০ সালের এইচএসসি ও আলিম, ফাজিল এবং কামিল পরীক্ষায় সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬,১২,৩৭৬ জন। সারাদেশে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার জন্যে মূল কেন্দ্র ছিল ১৭৭০টি। এতে ঢাকা বোর্ডের ২৫০টি, রাজশাহী বোর্ডের ২৫৯টি, কুমিল্লা বোর্ডের ১৫৪টি, যশোর বোর্ডের ১৯৭টি, চট্টগ্রাম বোর্ডের ৯৩টি এবং মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম ২৬৫টি, ফাজিল ২৬৪টি, কামিল ১১১টিসহ মোট ৬৪০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মূল কেন্দ্রের পাশাপাশি বেশ কিছু উপকেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছিল।

২০০০ সালের এইচএসসি ও মাদ্রাসা পরীক্ষার সকল বোর্ডসহ মোট ৩২,০৪৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৫,৯৯০ জন, রাজশাহী বোর্ডে ১২,৬৭৩ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৪,৭২২ জন, যশোর বোর্ডে ৪,৫৭০ জন, চট্রগ্রাম বোর্ডে ১,৭৬৮ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ২,২১২ জন বহিষ্কৃত হয়।

২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার তুলনায় ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃত ছাত্রের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। সংখ্যার দিক থেকে এসএসসিতে বহিষ্কৃত হয়েছিল ২৯,৮৭৭ জন, অন্যদিকে এইচএসসিতে বহিষ্কৃত হয় ৩২,০৪৩ জন। অথচ এসএসসিতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল প্রায় ১১ লাখ, কিন্তু এইচএসসিতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল এর প্রায় অর্ধেক, মাত্র ৬ লাখের অল্প কিছু বেশী। সে হিসেবে এসএসসির তুলনায় এইচএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃতের সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগেরও বেশী। এতে বোঝা যায়, সারাদেশে ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার সময় মার্চ মাসে যে গণসচেতনতা ও প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল তা সবিশেষ কার্যকর ফল দেয় মে মাসের এইচএসসি পরীক্ষার সময়।

এ বছরে এইচএসসি ও মাদ্রাসার পরীক্ষা চলাকালীন ২৬ জন কলেজ শিক্ষক বহিষ্কৃত হয় এবং আরো অধিক সংখ্যক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। এর মধ্যে রাজশাহী বোর্ডে ১৬ জন, যশোর বোর্ডে ৪ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

বোর্ডে ৬ জন শিক্ষক বহিস্কৃত হন। ঢাকা, চট্রগ্রাম, কুমিল্লা এবং কারিগরী শিক্ষা বোর্ডে এ বছর কোন শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়নি। ২০০০ সলের এসএসসি পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক ৯০ জন স্কুল শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছিল। শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতার চরম সমালোচনার মুখে দুই মাসের মাথায় যখন এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়,তখন কলেজ শিক্ষকদের বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে কলেজ শিক্ষকবৃন্দ শুধু দায়িত্ব সচেতন হননি, পরীক্ষার হলে তারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখান এবং নকল প্রবণতা রোধেও তার প্রভাব পড়ে।

শুরুতেই মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের পরীক্ষার্থীদের নিয়ে বিতর্ক

মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিষয়ে ২৬ এপ্রিল, ২০০০ তারিখে হাইকোর্ট যে রায় দেয় পরদিন ২৭ এপ্রিল পরীক্ষার দিনে সংবাদপত্রে তা শিরোনাম হয়ে আসে। ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক মাস পূর্ব থেকেই এই কলেজের ছাত্রীদের বিষয় নির্বচন জটিলতায় পরীক্ষা দেওয়ার সংকট নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

২৭ এপ্রিল বিভিন্ন সংবাদপত্র মতিঝিল মডেল কলেজের এই পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করে। এক যুগান্তর পত্রিকাই তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় ২৭ এপিল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে এর উপর তিনটি আলাদা আলাদা প্রতিবেদন করে। এতে একটিতে 'ওরা আজ পরীক্ষা দিতে পারবে' শিরোনামে বলা হয়, ১৩২ জন ছাত্রী সবাই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন্ব। এই সংবাদের একই স্তরকে আবার তারাই লিখেছে, 'হাইকোর্ট ১২৮জনকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছে'। 'সকলেই খুশী' শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠাতেই পত্রিকাটি আবার লিখে, ১৩২ জন ছাত্রী শেষ পর্যন্ত তাদের আন্দোলনে জয়ী হয়েছে। চার কলামের অপর একটি শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় একই পত্রিকায় আবার লিখে, '১২৮ জন ছাত্রীও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে'।

২৮ এপ্রিলও এই পত্রিকাটির ভ্রান্তি ঘোচেনি। যুগান্তর ২৭ এপ্রিলের এইচএসসি পরীক্ষার খবর পরিবেশন করতে গিয়ে ২৮ এপ্রিল লিখেছে, 'মতিঝিল মডেল কলেজের ১৩২ জন ছাত্রী সবাই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে'।

প্রকৃতপক্ষে, এদের ১১১ জন পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল, পরে আরো ১জন পরীক্ষা না দেওয়ায় ১১০ জন পরীক্ষা দেয়। পত্রিকাটি ন্যূনতম খবর অনুসন্ধান না করেই ডেস্কে বসেই এসব তথ্য পরিবেশন করেছে। সংবাদপত্রের তথ্য মাঝে মাঝে কতটা 'নির্ভরযোগ্য' উৎস থেকে পরিবেশন করা হয়ে থাকে এখান থেকে তা কিছুটা আঁচ করা যায়।

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার লগ্নে মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ১৩২ জন ছাত্রীর বিষয়ে পত্র-পত্রিকাগুলো যে এত সোরাগোল করেছির তা হচ্ছে, অনিয়ম করে হলেও তাদরে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কলামিষ্ট ড.মুনতাসির মামুন দৈনিক জনকণ্ঠে এ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন,তাঁর প্রবন্ধ ধরে পরদিন ৬ জন বুদ্ধিজীবি একটি বিবৃতি দেন। তাঁদেরও একই বাক্য ছিল, নিয়ম বিরুদ্ধ হলেও ১৩২ জন পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বুদ্ধিজীবিরা এটাও বলেন, এই অনিয়মটা শুধু এবারের জন্যেই, আর দেওয়া হবেনা, এটা যেন সরকার বলে দেয়। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবিরাও জানতেন, এটা অনিয়ম, আবার এই সুযোগ আর যেন না দেওয়া হয় সে জন্যে সতর্কও করছিলেন।

এভাবে তাঁরাও অনিয়মটারই বাস্তবায়ন চেয়েছেন। কেউ বিষয়টা দায়িত্ব সচেতন হয়ে দেখেননি এর পরিণাম কিহতে পারে। সারাদেশের ৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী যে ভুল করেনি, একটি কলেজের ১৩২জন সকলেই সে ভুল একসঙ্গে করলো কেন, এই প্রশ্ন কেউ ভেবে দেখেননি। একবার তাদের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিলে পরের বছরই যদি সারাদেশে একরম ৩ হাজার পরীক্ষার্থী এসে যায়, তখন কর্তৃপক্ষ তাদের অনুমতি না দিয়ে কোথায় যাবেন! বছর বছর এ অনিয়মকে যে তারপর কর্তৃপক্ষকেই বহন করতেহবে, এবং তখন সংবাদপত্রই আবার এনিয়েই সংবাদ পরিবেশন করবেযে,বোর্ডে দুর্নীতির কারণেই এই অনিয়ম বেড়ে গেছে। বিশেষ করে, মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের বিষয় নির্বাচনের ত্রুটি মেনে নিলে একমাস লেখাপড়া করে ৪০০ মার্কের পরীক্ষা দেওয়া সম্ভভ ধারণায়ও স্বীকৃতি দেওয়া হত। তাহলে তা দু'বছরের কোর্স করার প্রয়োজন নিয়ে কথা উঠতো। বিশেষ করে লেখপড়ার বিষয় নির্বাচনে ফ্রি স্টাইল

প্রবণতা আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিত। এ নিয়ে ২৬ এপ্রিলে দেওয়া হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, 'মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রীদের ফলাফল প্রদান স্থগিত থাকবে'।

২৮ এপ্রিল দৈনিক 'যুগান্তর' মতিঝিল মডেল কলেজের ছাত্রীদের বিষয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি মন্তব্য কলাম ছাপে। এতে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার চরিত্র মঞ্জুলিকার বাবার প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে বলা হয়, 'কোন মতেই ইঞ্চিখানেক এদিক ওদিক একটু হবার জো নেই'। সব মিলিয়ে মন্তব্য কলামটির মূল বক্তব্য ছিল শিক্ষামন্ত্রী কেন এত নিয়ম-নিয়ম করেন। একটু অনিয়ম হলে দোষ কি! সরাসরি নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের প্রকাশ্য জেহাদ এমনটা আর কখনো দেখা যায়নি।

সংবাপত্রের কল্যাণে নকলবাজরা হয়ে যায় 'বিক্ষুব্ধ ছাত্র'

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২৭ এপ্রিল। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই এই পরীক্ষা এবং পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে এভাবে নানা খরব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে মহানগরীর ছাত্ররা শিক্ষা বোর্ডে যে হামলা, ভাংচুর চালায় সংবাদপত্রগুলো তাকে 'বিক্ষোভ' বলে অভিহিত করে। পরীক্ষাকে সামনে রেখে এক কলেজের ছাত্রদের নিজ কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিবর্তে ভিন্ন কলেজে পরীক্ষা দানের ব্যবস্থাপনা চট্টগ্রামের নকলবাজ ছাত্ররা মেনে নিতে রাজী হয়নি। নকলবাজ ছাত্রদের সমর্থন করে সংবাদপত্র লিখে ঃ

ঘেরাওকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বোর্ডে বেশ কিছু ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। [দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ এপ্রিল ২০০০] বস্তুত সংবাদপত্রের কল্যাণে নকলবাজ উচ্ছৃংখল ছাত্ররা এভাবে 'বিক্ষুব্ধ' ছাত্রের মর্যাদা লাভ করে।

ভেন্যুর নামে পরীক্ষা কেন্দ্র

পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রকে সামনে করে প্রতি বছরই সৃষ্টি হয় নানা অনাকাঙ্ক্ষিত

ঘটনা। শিক্ষাবোর্ডের কর্তৃপক্ষ নানা চাপ ও অসহিষ্ণুতার মাঝে ভেন্যুর নামে পরীক্ষা কেন্দ্রই চালু করে থাকেন। এসএসসি পরীক্ষায় ভেন্যুর অনুমতি দিয়ে থাকেন জেলা প্রশাসকগণ, কিন্তু এইএসসি পরীক্ষায় ভেন্যুর অনুমতি দিয়ে থাকেন শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজেই। 'ভেন্যুর নামে পরীক্ষা কেন্দ্র' শিরোনামে একটি রিপোর্ট ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার প্রাক্কালে প্রকাশ করেছিল দৈনিক ইত্তেফাকঃ

নতুন কেন্দ্র খোলার উপর বিধি-নিষেধ থাকায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আগামীকাল ২৭ এপ্রিল হতে অনুষ্ঠিতব্য এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ভেন্যুর নামে কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, এগুলি খোলা হয়েছে বিভিন্ন প্রভাবশালী মহেলর চাপে পড়ে। ১৯৯৯ সালে পরীক্ষা কেন্দ্র ও ভেন্যুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬৪ ও ১৩। ১৯৯৯ সালে ঠাকুরগাও জেলার রানীসংকইল, নীলফামারী জেলার জনতা কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল কলেজ ও কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র ব্যাপক নকলের অভিযোগে বাতিল করার পর এবং আরও দুইটি কেন্দ্র হ্রাস করে কেন্দ্র খোলা হয় ২৫৯টি। কিন্তু ভেন্যু করা হয়েছে ২৪টি। ১৯৯৯ সালে যে চারটি কলেজ কেন্দ্র বাতিল করা হয় সেগুলির মধ্যে জনতা কলেজকে বাদ দিয়ি অন্য তিনটি কলেজে ভেন্যু করা হয়েছে। যে সব কেন্দ্রের সহিত এই সব ভেন্যু দেখানো হয়েছে তার মধ্যে দূরত্ব দেখানো হয়েছে সর্বোচ্চ দশ কিলোমটির। অভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, প্রভাবশালীদের চাপে শিক্ষা বোর্ড নকল নিয়ন্ত্রণ করতে চাহিয়াও পারছে না।...

১৯৯৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রটি ব্যাপক অনিয়মের জন্য বাতিল করা হলেও শেষ মুহূর্তে পরীক্ষার ভেন্যু স্থাপনের নামে কার্যত পুনর্বহাল করা হইয়াছে। জোরালো তদবিরের ফলেই ইহা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়াছে। অথচ ২৫ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরে ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ করা হয়েছে, বাতিলকৃত কেন্দ্রসমূহ কোনক্রমেই চালু করা হবে না। [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ২০০০]

নকল রোধে পুরস্কার ঘোষণা

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের জন্য মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানা পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি নকল ধরতে পারলে নকল প্রতি পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। ২৪ এপ্রিল শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজের অফিস কক্ষে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় এই ধরনের উদ্যোগে ভাল ফল পাওয়া যায়। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ এপ্রিল ২০০]।

নকল প্রবণতা দেখাতে তৎপর সংবাদপত্র ডেস্ক

২০০০ সালের পরীক্ষা বিষয়ক যে সব সংবাদ এইচএসসি পরীক্ষার প্রাক্কালে প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় সারাদেশে নকল বিরোধী একটা বড় রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত দেখানোতে সংবাদপত্রগুলো ছিল খুবই তৎপর। পত্রিকাগুলোর রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়, তারা বিশেষ বিশেষ টিম পাঠিয়েছিলেন নকলের খবর সংগ্রহ করে আনতে। বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলোর কুমিল্লা অভিযান এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। একটি পত্রিকা কুমিল্লার একটি সরকারী কলেজে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র ভাংচুরের ছবি ছাপে। ক্যাপশনে বলা হয়, নকলে বাধা দেওয়ায় এরা ভাংচুর করে' [যুগান্তর ২৮ এপ্রিল ১৯৯৯] । এর অর্থ এই যে, এই কেন্দ্রে নকল করতে দেওয়া হয়নি, নকল করতে দিলে তো ভাংচুর হতো না। নকল করার সুযোগ না দেওয়াতেই নকলবাজরা ভাংচুর করেছে। পত্রিকাটি পরীক্ষায় প্রথম দিনের সংবাদ পরিবেশন করে তারপর ঢালাওভাবে লিখেছে, নকলের অবাধ সুযেগা না পেয়ে পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ প্রদর্শনে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।...দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া দেশব্যাপী পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে গণহারে নকল হয়েছে। [যুগান্তর, ২৮ এপ্রিল, ২০০০]। একই পত্রিকা নকলের ছবি প্রকাশ করতে গিয়ে শেষ পৃষ্ঠায় কয়েকটি আলোকচিত্র প্রকাশ করে, এর মধ্যে দুটিতে হাফপ্যান্ট পরা দুটি শিশু দৌড়াচ্ছে, তৃতীয়টিতে অভিভাবকরা অপেক্ষা করছেন,চতুর্থ ছবিতে একজন পুলিশ এক নকলবাজকে গ্রেফতার করেছে। উপরিউক্ত সংবাদ এবং আলোকচিত্রগুলি প্রমাণ করছে না অবাধ নকল হচ্ছে।

কিন্তু সংবাদপত্রগুলোর শিরোনাম ও ইনট্রো-তে তা-ই দাবী করেছে। অথচ ভেতরের কথাতে বোঝা যায়, শিরোনামের মতো নকলের বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে এমন খবর পরিবেশনটা অতিরঞ্জিতই। পরীক্ষার্থী নকলের সুযোগ না পেয়ে ভাংচুর করছে কিন্তু সংবাদপত্র বলছে 'বিক্ষোভ' করছে। নকলের দাবীতে উচ্ছৃংখলতা কখনো 'বিক্ষোভ' অভিদায় মূল্যায়নকৃত হতে পারে না, কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদপত্র তা-ই করছে। অবাধ নকলের প্রমাণ নয়, বরং নকল করতে দেওয়া হচ্ছে না,এটা তারই প্রমাণ। ৩০ এপ্রিল 'যুগান্তর' খবর প্রকাশ করে বলে, রাজবাড়ি সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজে নকল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় 'বিক্ষুব্ধ' ছাত্র-জনতা পরীক্ষা কেন্দ্রে হামলা চালায়। নকল করতে সুযোগ দিলে তো নকলের দাবীতে আর সংবাদপত্রের ভাষায় 'বিক্ষোভ' আয়োজন হতো না। পুলিশ নকলবাজকে ধরছে, এটা নকলের খবর নয়, বরং নকল বিরোধী এ্যকশনের খবরেরই অংশ।

নকলমুক্ত পরীক্ষা এবং সংবাদপত্রের পরিবেশন প্রবণতা

এইচএসসি, কারিগরি এবং মাদ্রাসার পরীক্ষার ১৭২টি কেন্দ্র সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট এই প্রতিবেদন তৈরীকালে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০০০ সালের এই পাবলিক পরীক্ষায় শুরু থেকে সংবাদপত্রগুলোর একটি প্রবণতা (Trend) ছিল পরীক্ষায় নকলের 'ভয়াবহতা' দেখানো। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, এই কাজে পূর্ব থেকেই সংবাদপত্রগুলো তাদের মফস্বল সংবাদদাতাদের 'নকলের খবর ও চিত্র' পাঠানোর নির্দেশ দেয়। 'নকলের স্বর্গ' মনে করে ঢাকার প্রায় সবগুলো প্রধান কাগজ ২৭এপ্রিল ২০০০তারিখে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠায় কুমিল্লার বিভিন্ন কেন্দ্রে। মনে হয় সংবাদপত্রগুলো কুমিল্লা অভিযান আংশিক সফল হয়েছিল, ফলে কুমিল্লার রেদওয়ান আহমেদ কলেজ এবং অজিত গুহ কলেজে নকলের ব্যাপকচিত্র কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[ডেইলি ষ্টার, প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০]।

কিন্তু কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম কলেজে সংবাদপত্রের নকল খোঁজার মিশন সফল হয়নি। এক সময়ে চৌদ্দগ্রাম কলেজ 'নকলের স্বর্গ' বলে পরিচিত ছিল, কিন্তু এ বছর ২০০০ সালে এখানে নকলের ব্যাপক সুযোগ না পেয়ে নকলবাজ

পরীক্ষার্থীরা কলেজের আসবাবপত্র ভাংচুর করে। নকলে সুযোগ দেয়নি বলে আঃ রহিম নামে একজন প্রভাষককে এসব উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থীরা লাঞ্ছিতও করে। আবার কলেজে কর্তব্যরত মূল ভিজিল্যান্স টিম পরীক্ষার্থীদের নকলে সহায়তা দান করায় ইয়াসমিন আরা নামে একজন শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে এতোদিনকার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। (প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০০)।

অথচ সংবাদপত্রে এই ভাংচুরের খবরই বড় করে এসেছে। যেখানে নকলের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে প্রভাষকও লাঞ্ছিত হয়েছে, সংবাদপত্রে বড় 'ব্যানার হ্যাডের' কারণে মনে হয়েছে এটা নকলের বড় ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে এখানে নকল করতে দেওয়া হয়নি বলে এসব উচ্ছৃংখল আচরণ ঘটেছে, এমনকি দায়িত্বে অবহেলার জন্যে একজন শিক্ষিকাকে শাস্তি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে- সংবাদপত্রের এ ঘটনার treatment হচ্ছে এমনটি যে, এখানে 'ভয়াবহ' নকলের ঘটনা ঘটছে।

কুমিল্লার নাঙ্গলকোট কলেজ কেন্দ্রে নকল বিরোধী এ্যাকশন এতটা কঠোর হয়েছিল যে, প্রথম দিনই পরীক্ষা দিতে আসা একটি কলেজের ৯৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯১ জনই বহিষ্কৃত হয়েছিল। বহিষ্কৃত হয়ে এরা কলেজের বিজ্ঞানাগারে ভাংচুর চালায়। সংবাদপত্রগুলি নকল বিরোধী এই এ্যাকশনের খবর প্রশংসা করার পরিবর্তে 'বহিষ্কারের মাত্রা অনুযায়ী নকলের মাত্রা' বোঝাতে সংবাদটি প্রকাশ করে। (দেখুন, যুগান্তর, প্রথম আলো ২৮ এপ্রিল ২০০০)।

খুলনা থেকে কয়েকটি পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো সরেজমিনে ঘুরে এসে জানিয়েছিল, এই জেলার যে সব নকল প্রবণ কেন্দ্র ছিল সেগুলোতে এ বছর এত সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, এমন সুষ্ঠু পরীক্ষা স্থানীয়রা এর আগে কখনো দেখেননি। নকল প্রত্যাশী পরীক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে চলে গেছে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০০)।

কিন্তু দৈনিক জনকণ্ঠ এই সংবাদটি প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে চাপলেও প্রথম আলো ছেপেছে ভেতরে অন্যান্য খবরের ভেতের খুবই অগুরুত্বপূর্ণ করে। খুলনা

দেশের তৃতীয় বৃহত্তম মহানগরী হলেও এই জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর এই ভাল খবর অন্য সকল সংবাদপত্রে একেবারে উধাও হয়ে গেছে। দৈনিক ইত্তেফাক ৪মে এক উপসম্পদকীয় লিখে খুলনার নকলহীন পরীক্ষা নেওয়ার প্রশংসা করে।

অথচ কোন একটি মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে দেওয়াল টপকে নকল সরবরাহ করার রঙিন আলোকচিত্র সংবাদপত্রে বিশাল শিরোনামকৃত হয়ে এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, নকলে দেশ ছেয়ে গেছে। প্রথম আলো অবশ্য কুমিল্লা অঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর নকলের আলোকচিত্র ফলাও করে প্রকাশ করলেও একই দিন (২৮ এপ্রিল) তাদের প্রতিবেদনের মূল কাহিনীতে উল্লেখ করে যে, 'দেশের অধিকাংশ স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে এবং রাজধানীসহ প্রধান শহরগুলোতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে'। আবার অন্যত্র উল্লেখ করে, 'উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ কেন্দ্রে খোলাখুলি নকল ও সহিংসতা ঘটেছে'।

ইংরেজি পরীক্ষার পর অবশ্য সারাদেশেই পরীক্ষা-চিত্র সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। মুক্তকণ্ঠ (পয়লা মে) জানায়, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করায় ব্যাপক হারে নকলের প্রবণতা কমে যাওয়ার খবর মিলেছে। মুক্তকণ্ঠ ৩ মে তারিখে সারাদেশেই নকল প্রবণতা কমে এসেছে বলে রিপোর্ট করে। ভোরের কাগজ এবং আজকের কাগজও একই দিন (পয়লা মে) জানায়, এইচএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে পরীক্ষায় কড়াকড়ি হয়েছে, নকল কমে এসেছে। দৈনিক জনকণ্ঠ আলাদা শিরোনাম করেই খবর প্রকাশ করে যে, 'এইচএসসি পরীক্ষায় নকল কমেছে'। দৈনিক সংবাদও প্রায় একই সুরে (পয়লা মে) উল্লেখ করে, 'দেশের কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক কড়াকড়ির কারণে নকল হয়েছে কমম্ব। একই দিন বাংলাবাজার পত্রিকা জানায়, 'বাংলা পরীক্ষা থেকে নকল প্রবণতা কমতে শুরু করেছে'।

কিন্তু দৈনিক 'যুগান্তর' সারাদেশে নকল কমে যাওয়ার এই খবর মানতে চায়নি। তারা পয়লা মে লেখে, 'গণনকল, বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে এইচএসসি বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা হয়েছে'। 'যুগান্তর' অবশ্য পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই জ্যোতিষীর মতো ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছিল যে, এ বছর নকল হবে এবং ছাত্ররা পরীক্ষায়

নকল না করার কোন পরামর্শ মানবে না। (যুগান্তর, ২৭ এপ্রিল ২০০০)। ফলে তার ৭মে পরীক্ষার মূল্যায়ন করে লেখে, 'এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে সাড়াশি অভিযান পরিচালনার ঘোষণা চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। নকল আগের চেয়ে কমেনি, বরং বেড়েছে'। যুগান্তরের মতো দৈনিক ইনকিলাব ২৮ এপ্রিল লেখে যে, 'সর্বকালের ভয়াবহ নকল' এবং ৩মে লেখে, 'নকলের মহামারী কর্তৃপক্ষ সামান্যতমও রোধ করতে পারেনি'।

'নকলের মহোৎসব' শব্দ ব্যবহারে সংবাদপত্রের বিরোধিতা

নকলের প্রকোপ বোঝানোর জন্যে গত কয়েক বছর ধরে সংবাদপত্রগুলো 'মহোৎসব, 'মহোচ্ছব' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ শুরু করে। ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার সময় সকল সংবাদপত্রই এই শব্দযোগে খরব প্রকাশ করতে থাকে। অনেক সংবাদপত্রকে দেখা যায়, মহোৎসব শব্দ ব্যবহার করেই যেন আনন্দ পাচ্ছে। ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার সংবাদ পরিবেশনে দৈনিক মানব জমিনও এর ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষাকালে দৈনিক মানবজমিন এক সম্পাদকীয় লিখে নকলের সংবাদ প্রকাশে সংবাদপত্রের 'মহোৎসব' শব্দ ব্যবহারের বিরোধিতা করে। পত্রিকাটি সম্পাদকীয়তে বলে ঃ

১. 'দেশের সবক'টি কেন্দ্রের চিত্র হতাশাব্যঞ্জক নয়'।

২. 'হাজার হাজার কেন্দ্রের মধ্যে দু'একশ কেন্দ্রে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি ও এক-আধটু নকল হওয়ার ঘটনা ঘটতেই পারে'।

৩. 'একদিনে নকলমুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়'।

সংবাদপত্রগুলোকে উদ্দেশ্য করে 'মানব জমিন' আরো বলেঃ

৪. 'নকলে নিরুৎসাহিত করার জন্যে আমাকে বাহুল্যতা বর্জন করতে হবে। নকলের 'মহোৎসব' সর্বাংশে সঠিক নয়।...সে অবস্থা বিরাজমান নয় এবং এ বছর নকলের ব্যাপকতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

দৈনিক মানবজমিনের এই সম্পাদকীয় ছিল পরীক্ষা সম্পর্কে তার সংবাদ

পরিবেশনের এতদিনকার ভূমিকার ঠিক বিপরীত। সম্পাদকীয়টি পরীক্ষা সম্পর্কিত লেখালেখির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা আনে।

পরীক্ষার নকল রোধে নানারকম ব্যবস্থা

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতি দমনে নানারকম প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল কৌতুক কর ঃ

১. নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ভোলা সরকারী কলেজের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ৪ ফুট গভীর এবং ১০ ফুট চওড়া করে দীর্ঘ খাল খনন করা হয়। কর্তৃপক্ষ ভেবেছেন, এই খাল পার হয়ে নকল সরবরাহকারীরা কলেজের কাছে অসাতে পারবে না। ভোলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এইচএসসি পরীক্ষা প্রস্তুতি সভায় নকল প্রতিরোধে খাল খননের এই অভিনব উদ্যোগের কথা জানানো হয়। (দৈনিক ইত্তিফাক, ২৫ এপ্রিল ২০০০)।

২. রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের নকলমুক্ত মন নিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপণ দেয়। (তবে দৈনিক সংবাদপত্র 'যুগান্তর' ২৭ এপ্রিল ২০০০ সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপণের সমালোচন করে সম্পাদকীয় লেখে)।

৩. দেশের অধিকাংশ জেলা শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে আন্তঃকলেজ আসন বিনিময় ব্যবস্থার অধীনে এক কলেজের ছাত্রকে অন্য কলেজে পরীক্ষা দেওয়ানোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়। ঢাকা, চট্রগ্রাম, যশোর, খুলনায় এ পদ্ধতি খুবই কাজ দেয়। {দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ এপ্রিল ও ১৬ মে ২০০০ এবং প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০০}।

৪. নকলবাজদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হয়। [মুক্তকণ্ঠ, ৩০এপ্রিল ২০০০]।

৫. রাজশাহীতে অবসরপ্রাপ্ত এবং অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটিরত শিক্ষকদের দিয়ে ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়। [দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭মে ২০০০]।

৬. লালমোহন সরকারি শাহবাজুর কলেজের দেওয়ালে আলকাতরা লেপনকরে দেওয়া হয় যাতে বহিরাগতরা জামা-কাপড়ের আলকাতরা লেগে যাওয়ার ভয়ে দেওয়াল না টপকায়। [দৈনিক ইত্তিফাক, পয়লা মে ২০০০]।

৭. বেঞ্চে লিখে নকল করার সুযোগ প্রতিরোধ করতে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর কেন্দ্রে লোহার ব্রাশ এবং শিরিশ পেপার ব্যবহৃত হয়। [মুক্তকণ্ঠ, পয়লা মে ২০০০]।

৮. নকল সরবরাহকারীদের চিহ্নিত করতে কুষ্টিয়ায় ভিডিও ক্যামেরা প্রস্তুত রাখা হয়। ফলে মামলার ভয়ে বহিরাগতরা কেন্দ্রের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৮মে ২০০০]।

শিক্ষকদের ভূমিকার সমালোচনা

অন্যান্য বছরের পরীক্ষার মতো ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায়ও শিক্ষকদের ভূমিকা সমালোচিত হয়েছে। তবে ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার তুলনায় এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক। ফলে এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষক বহিস্কার কিংবা পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে শিক্ষকের অব্যাহতির ঘটনা ছিল কম।

১. আবার কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে দেখা গেছে সমান-সমান ঘটনা, এক শিক্ষক পরীক্ষায় নকল করতে দেননি বলে নকলবাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছেন, আবার এই একই কেন্দ্রে একজন শিক্ষয়িত্রী নকলে সহায়তা করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহিত পেয়েছেন।[এ বিষয়ে দেখুন, চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ কেন্দ্র সম্পর্কে প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০০ তারিখের রিপোর্ট]।

২. ঠাকুরগাঁও সালন্দর ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে কলেজ শিক্ষকদের পাশাপাশি কিন্ডারগার্টেন ও হাইস্কুলের শিক্ষকরাও পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করে।

এরা প্রকাশ্যে ছাত্রদের নকলে সহায়তা করে। [আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০০]

৩. বরিশালের হিজলা কেন্দ্রে জেলা প্রশাসক নকল রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শিক্ষকদের অসহযোগিতার জন্যে এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। [আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০০]

৪. রাজশাহীর পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহের অপরাধে দু'জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হন [ভোরের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০০]।

৫. কুড়িগ্রাম ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকদের সহায়তায় অবাধ নকল চলে। [ভোরের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০০]

৬. ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার কলেজের কমনরুমে বসে বহিরাগত ও শিক্ষকরা এক্ষেত্রে উত্তরপত্র লিখে দিয়েছে। [মুক্তকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৭. সাতক্ষীরায় কতিপয় শিক্ষকের অসহযোগিতার কারণে নকলরোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। [যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৮. একদল দুর্বল অনভিজ্ঞ শিক্ষক আমাদের গলারকাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৯. সান্তাহার সরকারি কলেজ ও রহিমউদ্দিন কলেজ কেন্দ্রে শিক্ষকদের সহায়তায় ফ্রিষ্টাইলে নকল হয়েছে। [মুক্তকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল]

১০. বগুড়ার নশরপুর কলেজের ম্যাজিস্ট্রেট দুম্বঘন্টা পরে কেন্দ্রে পৌঁছার কারণে শিক্ষকদের সহযোগিতায় বেপরোয়া নকল চলে। [মুক্তকণ্ঠ, পয়লা মে ২০০০]

১১. শিক্ষকদের পেশাগত কোন দায়বদ্ধতা নেই। জবাবদিহিতাও নেই। তাঁর ফাঁকি ধরার প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা নেই। [সংবাদ, ৩মে ২০০০]

১২. সিরাজগঞ্জ মাওলানা ভাসানী কলেজ কেন্দ্রে হিসাব বিজ্ঞানের শিক্ষক লুৎফর রহমান নকল সরবরাহের সময় হাতে নাতে গ্রেফতার হন। [দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো,৩মে ২০০০]

১৩. যশোরে নকল সরবরাহের সময় দু'জন মাদ্রাসার শিক্ষক ধরা পড়েন এবং বহিস্কৃত হন। [প্রথম আলো, সংবাদ, ৫মে ২০০০]

১৪. গাজীপুরের বেলাসী সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্রে বোরখার নীচে করে মাদ্রাসার ছাত্রীরা প্রকাশ্যে নকল করলেও মাদ্রাসার শিক্ষকরা বাধা দেননি, বরং সহায়তা করেছেন। [ভোরের কাগজ, ৫ মে ২০০০]

১৫. নকল সরবরাহকারী ও সহায়তাকারী শিক্ষকদের শাস্তি না হওয়ায় পরীক্ষায় অসদুপায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব শিক্ষকদের অনেকের নামের সঙ্গে 'প্রফেসর' শব্দ ব্যবহার করা হয়। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৫মে ২০০০]

১৬. মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের কিছু সংখ্যক শিক্ষক কিভাবে নকল করতে হবে তার ওপর ছাত্রদের বিশেষ কোচিং করিয়েছেন। এই কলেজের ইংরেজির একজন প্রভাষক নকলের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন পরীক্ষার্থীদের। [সাপ্তাহিক ২০০০, ৫মে ২০০০]

১৭. নকল রোধের প্রধান কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাশ নেয়া নিশ্চিত করতে হবে। [যুগান্তর, ৭মে ২০০০]

তবে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষকদের এমন ভূমিকা এসএসসি পরীক্ষার তুলনামূলকভাবে কম। বোঝা যায়, স্কুল শিক্ষকদের তুলনায় কলেজ শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ বেড়েছে। দেখা যায়, মাদারীপুরে প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে একযোগে সহযোগিতা করে নকল দমন করেছে শিক্ষকরা। [মুক্তকণ্ঠ, ১১মে ২০০০]

শিক্ষকদের জন্যে পুরষ্কার

শিক্ষকরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সবার চেয়ে বেশী হুমকির সম্মুখীন হন। ফলে সরকার থেকে তাদের জন্যে পুরষ্কারও রয়েছে। রাজশাহী সিটি কলেজে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন কলেজের জনৈক প্রভাষক এবং একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান তাঁদের বাসায় গিয়ে দেখা করে সমবেদনা জানান এবং পুরষ্কার প্রদান করেন। [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫মে ২০০০]

দৈনিক জনকণ্ঠে ৩ মে ২০০০ তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমতির একে এম ইসলাম ও কাজী ফারুক আহমেদ সৎ, নীতিবান এবং সাহসী শিক্ষকদের জন্যে শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিশ্রুত পুরষ্কার ও সণ্মানী প্রদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে সংবাদপত্র

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশাসনের ভূমিকার মিশ্ররূপ প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। প্রধানত পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরের পরিবেশ সুন্দর রাখার দায়িত্ব পুলিশ এবং কর্তব্যরত ম্যাজিষ্ট্রেটের। ছাত্রদের কাছ থেকে নকল বের করা ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব নয়, কিন্তু শিক্ষকরা যেহেতু নকল ধরেন না, সেহেতু ম্যাজিষ্ট্রেটরা এটা করতে বাধ্য হচ্ছেন, ফলে শিকক্ষকরা এর প্রতিবাদও করতে পারছেন না, তার নিজের দুর্বলতার কারণেই। শিক্ষকরা যদি তাদের নিজের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতেন, তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক নকল ধরার বিরুদ্ধে তাঁরা অবস্থান নিতে পারতেন। কিন্তু নিজেরা যেহেতু কাজটি করছেন না, ফলে অন্যের হস্তক্ষেপ তার মেনে নিতে হচ্ছে।

৩মে ২০০০ তারিখে সংবাদ-এ প্রকাশিত এক উপসম্পাদকীতে পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন না করায় শিক্ষকদের প্রবল সমালোচনা করা হয়, কিন্তু একই নিবন্ধে বলা হয় 'নকল বন্ধে' প্রশাসনের আচরণ কর্তৃত্ববাদিতার এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, তারা ধরেই নিয়েছেন 'সমস্ত শিক্ষকই নকলের সহায়তাকারী'। বস্তুত এই

অভিযোগ সত্য হলেও শিক্ষকরা সামাজিকভাবে এর প্রতিবাদ করার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। ফলে প্রশাসনের কর্তৃত্ব তাকে হজম করতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে প্রশাসনের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তার জন্যে 'সন্মানী' 'মাসোহারা' উপঢৌকন যে একটি 'কালচারে' পরিণত হয়েছে সেটি একটি 'ওপেন সিক্রেট' বটে। সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে প্রচুর খবর প্রকাশিত হয়। এ খবর ম্লান করে দেয় সে সব ঘটনায় যেখানে নকল করতে সুযোগ না দেওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১. ভোরের কাগজ ২৮ এপ্রিল ২০০০ তারিখে খবর প্রকাশ করে জানায়, নাসিরাবাদ বালক স্কুল কেন্দ্রে সকাল ১১টা পর্যন্ত কোন ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করতে যায়নি।

২. রাউজান কলেজ ও গহিরা কলেজ কেন্দ্রে একদিকে অবাধ নকল হয়েছে, অন্যদিকে ম্যাজিস্ট্রেট ডাবের পানি খেয়েছে। [ভোরের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০০]

৩. প্রশাসনের দুর্বলতার কারণেই বোর্ডের পরীক্ষায় নকল হচ্ছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৪. জামিরাত কলেজ কেন্দ্রে শিক্ষকদের ডিউটির পাওনা টাকার ২৬ হাজার নজরানা দিতে হয়েছে প্রশাসনে ডিউটিরত আনাসর, ম্যাজিস্ট্রেটকে।

৫. পরীক্ষা শুরুর ২ ঘন্টা পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট না পৌঁছায় অবাধ নকল চলে। [মুক্তকণ্ঠ, পয়লা মে ২০০০]

৬. ম্যাজিস্ট্রেটের ভুলের কারণে বাণিজ্য নীতি পরীক্ষায় প্রথমপত্রের বদলে দ্বিতীয়পত্র বিলি হয় [ভোরের কাগজ, ৪মে ২০০০]।

৭. মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা বরাবরের মতো লক্ষ্যণীয়। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মে ২০০০]

কুমিল্লায় এত নকলের সংবাদ

প্রশাসনের সুকঠিন কড়াকড়ি ভূমিকার কারণে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় নকল কমে আসার বিভিন্ন চিত্রের ব্যতিক্রম ঘটনা উপরিউক্ত সংবাদগুলো। এমন ব্যতিক্রমের আরো একটি উদাহরণ পাওয়া যায় ১৯ মে ২০০০ তারিখে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের মধ্য দিয়ে। 'যুগান্তর' ২০০০ সালে নকলের সংবাদ নিয়ে এতোটা 'মাতামাতি' করেছিল যে, মনে হয়েছে তারা নকলের বিরুদ্ধে জেহাদকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৯মে 'কুমিল্লায় এত নকল কেনস্ব শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি নকলবাজদের ক্রীড়ণক হিসেবে কাজ করে। কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার নির্বাহী অফিসারের নকল সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যুগান্তর-এর রিপোর্ট তৈরী করা হয় বলে উল্লিখিত ছিল। এতে আরো বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে হোমনা উপজেলার নির্বাহী অফিসার এই রিপোর্ট তৈরী করেছেন। রিপোর্টটিতে কুমিল্লায় নকলের জন্যে বোর্ড চেয়ারম্যানকে দায়ী করে বলা হয়, নকলের জন্য ব্যবহৃত গাইডগুলির প্রকাশকদের সঙ্গেও নকলের জন্যে বোর্ড চেয়ারম্যানকে দায়ী করে বলা হয়, নকলের জন্য ব্যবহৃত গাইডগুলির প্রকাশকদের সঙ্গেও বোর্ড চেয়ারম্যানের সম্পর্ক রয়েছে।

সংবাদপত্রে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শীর্ষক প্রতিবেদন তৈরী কালে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে হোমনার নির্বাহী অফিসারকে নকল সম্পর্কে কোন প্রতিবেদন পাঠানোর জন্যে বলা হয়নি। তাহলে হোমনা উপজেলার নির্বাহী অফিসার কেন এত উৎসাহ ভরে এমন একটি প্রতিবেদন তৈরী করে বোর্ড চেয়ারম্যানের চরিত্র হননে 'যুগান্তর' পত্রিকা পর্যন্ত আসলেন! অনুসন্ধানে আরো দেখা গেছে, হোমনা উপজেলার নির্বাহী অফিসারের স্বউদ্যোগে তৈরীকৃত এই প্রতিবেদন আর কোন সংবাদপত্রেও পাঠানো হয়নি, অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি, একমাত্র 'যুগান্তর' ছাড়া।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে নকলের বিরুদ্ধে বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনেই একটি কেন্দ্রের (কুমিল্লার নাঙ্গলকোট কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসা একটি কলেজের) ৯৩জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯১ জনকেই বহিষ্কার করা হয় (২৮ এপ্রিল

২০০০ তারিখে 'যুগান্তর' পত্রিকাতেই এই সংবাদ প্রকাশিত হয়)। নকলের সুযোগ না পেয়ে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম কলেজে নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা ভাংচুর করে। [যুগান্তর ২৮ এপ্রিল ২০০০]।

কুমিল্লার অন্যান্য উপজেলায়ও নকল বিরোধী সাড়াশি অভিযান অব্যাহত ছিল। সংবাদপত্রগুলিতে দেখা যায় কুমিল্লার অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রেই কুমিল্লা বোর্ড থেকে পাঠানো ভিজিল্যান্স টিমের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব ঘটেছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নকল বিরোধী এই অভিযানে রুষ্ট হয়ে পড়েন কুমিল্লার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের নকলবাজ শিক্ষক, অভিভাবক এবং কর্তৃপক্ষ।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, হোমনা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে হোমনা পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে যে বিরাট অঙ্কের সম্মানী দেওয়া হয়েছিল, তাতে শেষ কুল রক্ষা হয়নি কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন নকল বিরোধী সাড়াশি অভিযানের কারণে। ফলে প্রশাসনের এই কর্মকর্তা ক্ষুব্ধ হয়ে নকলের জন্য তো বটেই, নকলের ব্যবহারে প্রকাশিত গাইড বইগুলির প্রকাশনার সাথেও সংযোগ পেতে দিয়েছেন কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষের। পরীক্ষায় নকলের দুর্বলতার জন্যে প্রশাসনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ বিশেষ করে আর্থিক সংযোগের যে সীমিত অভিযোগ রয়েছে, কুমিল্লার হোমনা উপজেলার নির্বাহী অফিসারের রিপোর্ট এবং তা থেকে 'যুগান্তর' পত্রিকাকে বেছে প্রকাশ করার ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্যতার হদিস মেলে। আবার দেখা যাচ্ছে, যে সংবাদপত্র নকলের বিরুদ্ধে এত উল্লাসের সঙ্গে খবর ছেপেছে তাদেরও সংযোগ ঘটেছে এই মাফিয়া চক্রের সাথে।

২৫ মে ২০০০ ভোরের কাগজ এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায় যে, পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে ঢাকা এবং কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিশদ বর্ণনা করে সংবাদপত্রটি লেখে ঃ

কুমিল্লা বোর্ডে চলতি বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ করায় নকলবাজ কেন্দ্র থেকে নিয়মিত সম্মানী পায় প্রশাসনের এমন কিছু কর্মকর্তাও নানা উপায়ে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।..

সম্প্রতি একটি দৈনিকে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে নানা রকম কাল্পনিক তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। [ভোরের কাগজ, ২৫মে ২০০০]

পরীক্ষায় রাজনৈতিক কর্মীদের ভূমিকা সম্পর্কে সংবাদপত্র

১. দৈনিক ইত্তেফাক ৮মে ২০০০ তারিখে রিপোর্ট করে যে,শেরপুর জেলায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গত বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম এত সুন্দর এবং নকলহীন পরিবেশে পরীক্ষা হচ্ছে তার কারণ হল, স্থানীয় ছাত্রনেতাদের অনেকেই কারাগারে দিন কাটাচ্ছে। উপরিউক্ত সংবাদটির মধ্য দিয়ে ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক টাউটদের পরীক্ষায় ভূমিকার বিষয়টি টের পাওয়া যায়। এই শক্তিটি না থাকলে সম্ভবতঃ দেশের সকল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকেই নকল শব্দটিই উঠে যেত।

২. প্রথম আলো পয়লা মে ২০০০ তারিখে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে, রাজশাহীর বেশ কিছু কেন্দ্রে নকলহীন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারছে এই কারণে যে, সেখানে নকলের পক্ষে কারো (রাজনীতিকদের) কোন প্রভাব কার্যকর হচ্ছে না। সরকারি দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সম্মত হলে পরীক্ষায় নকলবাজি নিয়ন্ত্রণে আনা অবশ্যই সম্ভব।

৩. সংবাদ ৩ মে ২০০০ তারিখে এক উপসম্পাদকীয়তে একটি কেন্দ্রের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়। এতে বলা হয়, '(একটি পরীক্ষা কেন্দ্র).. মোটামুটি নিয়ন্ত্রিতই ছিল। হঠাৎ মোবাইল হাতে কয়েকজন ছাত্রনেতা ঢুকে পড়লো। ছাত্ররা সব উঠে দাঁড়ালো। নেতারা বক্তৃতা দিলেন। যার মর্মার্থ-'তোমরা নির্ভয়ে পরীক্ষা দাও, শিক্ষকরা কিছু বলবে না', এরপর থেকে কেন্দ্রের চেহারা আর পূর্বের মত রইল না। অর্থাৎ নকল শুরু হয়ে গেল।

উপসম্পাদকীয়টি পরে উল্লেখ করে, সুষ্ঠু পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা খুব প্রয়োজন।

৪. রাঙ্গুনিয়া ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে নকলে সহযোগিতা করেছেন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা। [দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৫. চট্রগ্রামে মহিলা কলেজে নকলের দাবীতে জামায়াতে ইসলামির স্থানীয় অঙ্গ সংগঠন মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি নামক একটি সংগঠন ভাংচুর চালায়। [প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৬. সোনারগাঁও ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে নকলের খবর পরিবেশন করায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা মনিরুজ্জামান নামে এক সাংবাদিককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। [দৈনিক ইত্তেফকা, ৩মে ২০০০]

৭. দাউদকান্দি (কুমিল্লা) হাসানপুর শহীদ নজরুল ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার খাতা ছিনতাই করতে আসেন কলেজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। পরে তিনি গ্রেফতার হন। [প্রথম আলো, ৩ মে ২০০]

পরীক্ষা-আইনের প্রয়োগ এবং আদালতের অবস্থান

দৈনিক ইত্তিফাক ৩০ এপ্রিল ২০০০ সংখ্যায় অভিযোগ করে যে, পাবলিক নকল বিরোধী আইনের প্রয়োজন নেই। বস্তুত পরীক্ষায় দুর্নীতি প্রতিরোধে অনেক আইন রয়েছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেসব আইনের প্রয়োগ খুব বেশী নেই। তবে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে আইন প্রয়োগের কতকগুলি ঘটনা উল্লেখ করার মতো।

১. রিয়াজউদ্দিন তালাকুদার কলেজে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় আশরাফ আলী নামক এক নকল সরবরাহকারীকে তাৎক্ষণিক সংক্ষিপ্ত আদালত ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে। [ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

২. চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজে নকলের সুযোগ না পেয়ে হামলা চালানোর অভিযোগে ৫ জনকে জননিরাপত্তা আইনে বন্দী করা হয়। [মুক্তকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৩. কুষ্টিয়ায় নকল সরবরাহকারীদের চেহারা চিনে রাখতে পুলিশ ভিডিও ক্যামরো ব্যবহার করে। ফলে মামলার ভয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর ধারে কাছে বহিরাগতরা যায়নি। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৮মে ২০০০, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬মে ২০০০]

কুমিল্লার জুরানপুর আদর্শ ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ব্যাপক নকল হতে থাকলে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা চলাকালীনই কেন্দ্রটি বাতিল করে দেন। সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের বিধান শিক্ষা বোর্ডের রয়েছে। এছাড়া, সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্যে নকলের অভিযোগে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল একটি আইনী প্রক্রিয়াও। কিন্তু জুরানপুর কর্তৃপক্ষ নকল দমাতে ব্যর্থ হলেও হাইকোর্ট এসে হাজির হয়। ১০মে হাইকোর্ট কেন্দ্র বাতিলের নির্দেশের বিরুদ্ধে রুলনিশি জারী করে দেয়।

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে আদালতের রায়ের আরো ঘটনা ঘটে। কুমিল্লায় ১৯৯৯ সালে অব্যবস্থাপনা ও ব্যাপক নকলের অভিযোগে ২টি কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছিল, পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তারা পরীক্ষা কেন্দ্র স্থায়ী করে নিয়ে আসে।

আবার মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে কক্সবাজারে একটি নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেন। কিন্তু কক্সবাজার উখিয়া উপজেলার মাদ্রাসা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে কক্সবাজার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা করায় আদালত কক্সবাজার মাদ্রাসার নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দেন।

মাদ্রাসার পরীক্ষা সম্পর্কে সংবাদপত্র

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭মে ২০০০ সংখ্যায় একটি অভিযোগ উত্থাপন করে বলে যে, মাদ্রাসা পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা তার খবর রাখার বা মনিটরিং করার ক্ষেত্রে কারো তাড়া নেই। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরেও সব সময় মাদরাসার পরীক্ষার সময় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

বস্তুত একথা সত্য যে, স্কুল-কলেজের পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে যতোটা উত্তেজনা ও হৈ চৈ হয়, মাদরাসার পাবলিক পরীক্ষা সম্পর্কে ঠিক সমানভাবেই থাকে উপেক্ষা, নীরবতা এবং অবহেলা। ফলে মাদরাসা পরীক্ষায় দিনের পর দিন গড়ে উঠেছে একটি অপরাধ চক্র। ধর্ম ভিত্তিক এই পরীক্ষায় যতোটা দুর্নীতি হয়, অন্য কোন পাবলিক পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে ততোটা নয়। পাবলিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের প্রতি 'নজরানা' দেওয়ার যে খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তার বেশীর ভাগটাই ঘটে মাদরাসার পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে।

মাদ্রাসার ছাত্ররা বেশীর ভাগই দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল পাশ করে সমাজে ধর্মনেতা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু এসব পরীক্ষায় মাদরাসার ছাত্ররা শুধু যে অনৈতিক পথই অবলম্বন করে তা নয়, ধর্মীয় বই, বিশেষ করে কোরআন, হাদিস এবং বিভিন্ন ফেকাহ শাস্ত্রের গ্রন্থ এবং গ্রন্থের পাতা যেভাবে তারা পদদলিত করে, বাথরুম-টয়লেটে ফেলে নকলের জন্যে ব্যবহার করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে তা অকল্পনীয়। এসব ব্যাপারে মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে পাপবোধ তো নেই-ই, বরং উৎসবের সঙ্গেই তারা নকলবাজীর কাজে ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থগুলোর অবমাননা করে থাকে।

১৯৯৮ সালে ঢাকার আলিয়া মাদরাসা, ডেমরার তামিরে মিল্লাত মাদরাসা এবং মোহাম্মদপুরের একটি মাদরাসায় এই ধারার সর্বোচ্চ শ্রেণী কামিল পরীক্ষায় সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষা দিতে আসা মাদরাসার ছাত্রদের শতকরা ৯৮ ভাগই নকল করে থাকে। এদের অনেকে পায়ের জুতায় কোরআনের পাতা নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। [এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, মুক্তকণ্ঠ, সংবাদ, ৯জুন ১৯৯৮]

২০০০ সালের আলিম, ফাজিল এবং কামিল পরীক্ষার স্বল্প কয়েকটি কেন্দ্রের চিত্র দেখা যোত পারে ঃ

১. আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার প্রথম দিনে সারাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় নকলের মহোৎসব চলেছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৫মে ২০০০]

২. যশোরে কোরআন মজিদ পরীক্ষায় জাঙ্গিয়ার নীচেও ও বাথরুমে ফেলে নকল করা হয়েছে। দু'জন মাদ্রাসার শিক্ষক নকল সরবরাহের অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়। [প্রথম আলো, সংবাদ ৫মে ২০০০]

৩. গাজীপুর সিনিয়র বেলামী মাদরাসার পরীক্ষার্থীনীরা বোরখার নীচে বই ফেলে নকল করেছে। [ভোরের কাগজ, ৫মে ২০০০]

৪. চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ মাজিদিয়া আলিয়া মাদরাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের দায়ে প্রথম দিনেই ৮০ জন বহিষ্কৃত হয়। [ভোরের কাগজ, ৫মে ২০০০]

৫. ময়মনসিংহের আব্বাসিয়া আলিয়া মাদরাসায় টুপীর ভেতরে নকল এনে

লেখার সময় পরীক্ষার্থীরা ধরা পড়ে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৭মে ২০০০]

৬. ১৮টি জেলার ২৯টি মাদরাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে কামিল শ্রেণীর হাদিস পরীক্ষায় নকলের দায়ে ৯২ জন পরীক্ষার্থী বহিস্কৃত হয়। [দৈকিন ইনকিলাব, ৭মে ২০০০]

৭. চট্রগ্রামের রাউজান এফ কে জামিউল উলুম কামিল পরীক্ষা কেন্দ্রে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সামনেই ফ্রি ষ্টাইলে নকল চলে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ১০মে ২০০০]

৮. বরিশাল সাগরদী আলিয়া মাদ্রাসায় আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় দেদারছে নকল চলছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩মে ২০০০]

৯. চাঁদপুর হাজীগঞ্জ দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসা এবং ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধ পায়ে ঠেলে এসব কেন্দ্রে মাদ্রাসার ছাত্ররা নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছে।...জাঙ্গিয়ার ভেতর থেকে হাদিস ও কোরআনের পাতা বের করে আনে। মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শক বলেছেন, স্কুলের ছাত্রদের যে নৈতিকতা জ্ঞান আছে, মাদ্রাসার ছাত্রদের তাও নেই। [সরেজমিন প্রতিবেদন, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, ভোরের কাগজ, ২৪মে ২০০০]।

২৪মে ২০০০ তারিখে ঢাকার তিনটি জাতীয় দৈনিকে (ইত্তেফাক, সংবাদ ও ভোরের কাগজে) চাঁদপুরের কয়েকটি কলেজ ও কয়েকটি মাদ্রাসার পরীক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে যে সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাতে ঘটনাক্রমে দেখা যায় ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসাটির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন মাওলানা আবদুল মান্নান। মাওলানা মান্নান আবার দৈনিক ইনকিলাব-এরও সত্ত্বাধিকারী। সুতরাং তাদের নিজেদের মাদ্রাসায় নকল হচ্ছে এ খবর যেন তাদের মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। ফলে ২৫মে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা একটি খরব প্রকাশ করে যে চাঁদপুরে কোন নকল হচ্ছে না। ইত্তেফাক, সংবাদ, ভোরের কাগজ প্রকাশিত রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করে দৈনিক ইনকিলাব একই দিন আরো লিখে যে, 'চাঁদপুর হচ্ছে নকলহীন পরীক্ষার একটি মডেল'। [দৈনিক ইনকিলাব, ২৫মে ২০০০]।

বস্তুতঃ দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও ভোরের কাগজ ২৪মে ২০০০ চাঁদপুরের

কলেজগুলিতে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের খরব ঠিকই পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু সংবাদ দাতারা কলেজগুলির পাশাপাশি যখন মাদরাসার পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করতে গেছেন তখনই এই ভয়াবহ ও কুৎসিৎ চিত্র অবলোকন করেছেন।

নকলমুক্ত পরিবেশে দেশের কোথাও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত ২৫মে তারিখের প্রতিবেদনে এই প্রথম স্বীকারোক্তি ঘটেছে। এর আগে দৈনিক ইনকিলাব প্রায় প্রতি দিন এখবরই প্রকাশ করেছে যে, দেশে কোথাও নকল ছাড়া পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, দেশ রসাতলে গেল'। দেখুন, দৈনিক ইনকিলাব-এর ৩মে ২০০০ তারিখে খবর, যেখানে লেখা হয়েছে 'দেশ জুড়ে পরীক্ষায় কর্তৃপক্ষ নকলের মহামারী সামান্যতমও রোধ করতে পারেনি'। ৭মে তারিখে দৈনিক ইনকিলাব একটি রঙিন কার্টুনও প্রকাশ করে। এতে শিক্ষামন্ত্রীর কার্টুন করে এটি প্ল্যাকার্ড প্রকাশিত হয় যেখানে লেখা ছিল, 'নকল জাতির মেরুদন্ড'।

অর্থাৎ ২৪মে ইত্তেফাক, ভোরে কাগজ ও সংবাদ-এ চাঁদপুরের মাদরাসা (কলেজের নয়, চাঁদপুরের কলেজগুলিতে সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা হচ্ছে বলে একই খবরে তারা প্রকাশ করেছিলেন– পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের খবর প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের অবস্থান ছিল ভিন্ন রকম। ২৪মে-র পর থেকে দৈনিক ইনকিলাব খবর প্রকাশ করতে থাকে যে, দেশের অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে ভাল পরীক্ষাও হচ্ছে। এভাবে নকল সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাব তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। তবে মাওলানা মান্নানের ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার নকলের খরব সংবাদপত্রে পূর্ব থেকেই প্রকাশিত হয়ে আসছিল। এই কেন্দ্রে ৫১ জন পরীক্ষার্থী প্রবেশ পত্র চাড়াই পরীক্ষা দিয়েছে এবং প্রথম দিনেই নকলের দায়ে ৮০ জন মাদ্রাসা পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে [দেখুন, ভোরের কাগজ ৫মে ২০০০]। দৈনিক ইনকিলাব ৬মে ২০০০তারিখে এই মাদরাসটিতে ৩০ এপ্রিল এক অনুষ্ঠানে মাওলানা মান্নানের বক্তব্য প্রকাশ করেছিল, যেখানে মাওলানা সাহেব তার মাদরাসার আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার্থীদের নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন। [দেখুন, দৈনিক ইনকিলাব, ৬মে ২০০০]। দৈনিক ইনকিলাব ১৫মে ২০০০ তারিখে জনৈক শাহেদা ওবায়েদ লিখিত একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে শিক্ষকদের নকলের কারণে পরীক্ষার খাতা দেখা বর্জন করারও আহ্বান জানিয়ে উস্কানী দিয়েছিল।

নোটবই, গাইড বইং এবং সংবাদপত্র

পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকলের জন্যে ব্যবহৃত গাইড বই, নোট বইয়ের সমালোচনা সংবাদপত্রগুলো করলেও সংবাদপত্র নিজেরাই গাইড বই, নোট বইয়ের পৃষ্টপোষকতা করে থাকে। দেশের অধিকাংশ জাতীয় সংবাদপত্রেই বর্তমানে বিভিন্ন নামে ছাত্রদের গাইড-পাতা, নোট-পাতা নিয়মিত বের কের থাকে। শুধু তাইনা, এসব পাতা যখন নকলের কাজেও ব্যবহার হয়, সংবাদপত্র সে খবরও সন্তোষের সঙ্গে পরিবেশন করে থাকে আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে। গাইড-পাতা ও নোট-পাতার সাজেশন ও সম্ভাব্য উত্তরমালা যে নকলবাজদের কাজে লেগেছে, সে সংবাদ পরিবেশন করে দৈনিক জনকণ্ঠের চট্টগ্রাম প্রতিনিধি জানিয়েছেনঃ

দৈনিক জনকণ্ঠে নিয়মিত প্রকাশিত 'শিক্ষা সাগরম্ব পাতা নকলের গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হযেছে। শিক্ষা সাগর পাতার এসব কপিতে সম্ভাব্য কয়েকটি রচনা রয়েছে [দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০০]। একদিন অন্য একটি সংবাদপত্র পরীক্ষাকে সামনে রেখে সারাদেশে এক শ্রেনীর অসাধু প্রকাশক নকলে সহায়তাকারী যে সব গাইড ও ক্ষুদ্রাকৃতির নোটবই প্রকাশ করে তার সম্পর্কে সচিত্র রিপোর্ট উপস্থাপন করে। 'টেকনিক গাইড' শিরোনামে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে পপি প্রকাশনা ও আরিফ প্রকাশনী নামে দুইটি প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত নকল-সহায়ক পুস্তিকার কথা উল্লেখ করে বলা হয়ঃ

মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির পাশাপাশি নকলপ্রবণ এলাকাগুলোতে পরীক্ষার্থী, ফটোকপির ব্যবসা আর 'টেকনিক গাইড' বিক্রেতাদের কাজ চলছে একযোগে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে সারাদেশে শুরু হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত খবর, কিছু অসৎ শিক্ষকের সাহায্যে অসাধু ব্যবসায়ী নকলে সহায়ক বিশেষ ধরনের গাইড বই প্রকাশ করে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার বইয়ের দোকানগুলোতে সরবরাহ করছে। টেকনিক গাইড, ম্যাজিক গাইড, বুলেট গাইড-ইত্যাদি বাহারি নামের এ গাইডগুলোর আকৃতি সাধারণত পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এবং পৌনে চার ইঞ্চি চওড়া। পরীক্ষার হলে বহনের সুবিধার্থে গাইডগুলো এ সাইজের করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আরও ছোট সাইজেরও হয়। এসএসসি, এইচএসসিসহ বিভিন্ন পরীক্ষার সময় মফস্বল এলাকায় সব

বিষয়ের ওপর লেখা এ গাইডগুলো বিক্রির ধুম পড়ে যায়। নকলে নির্ভরশীল পরীক্ষার্থীদের মাঝে এর সমাদর যথেষ্ট। [যুগান্তর, ২০ এপ্রিল ২০০০]।

২৪ এপ্রিল বাংলাবাজার পত্রিকা এবং ২৫ এপ্রিল ভোরের কাগজও নকল সহায়ক পকেট সাইজ বিভিন্ন গাইড দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিক্রি হওয়ার খরব প্রকাশ করে। ভোরের কাগজ টেকনিক গাইড এর পাশাপাশি ম্যাজিক গাইড, বুলেট গাইড ইত্যাদির খবর দিয়ে জানায়, এদের আকৃতি সাড়ে চার ইঞ্চি বাই সাড়ে তিন ইঞ্চি মাপের। প্রতিটি গাইড বিক্রি হয় ৬০ থেকে ১০০টাকায়। ফটোষ্ট্যাট দোকানগুলো নোটবই ছোট করে প্রীন্ট করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে বলে রিপোর্টগুলোতে উল্লেখ করা হয় [ভোরের কাগজ ২৫ এপ্রিল ২০০০এবং বাংলাবাজার পত্রিকা ২৪ এপ্রিল ২০০০]। পাবলিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে সমাজ বিরোধী প্রকাশনা সংস্থাগুলো যে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় তার সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকও রিপোর্ট করেঃ দুইপক্ষই যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া দিয়াছে। বোর্ডের পরীক্ষা যে কোন মূল্যে নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করা হবে-এই সংকল্পের কথা ঘোষণা করিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড। কিন্তু এই ব্যাপারে নকল সরবরাহকারীদের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া, ভয়-ভীতি লক্ষ্য করা যাইতেছে না। নকলের জন্য বাহির হইয়াছে নানা টেকনিক। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নোট বই। বিভিন্ন নামে ইহা বাজারজাত হইতেছে। **অভিভাবকদের সামনেই ছাত্র-ছাত্রীরা এইসব গাইড বই কিনিতেছে।** এইচএসসি পরীক্ষার হলে নকলের জন্য বরিশালে বাহির হইয়াছে বাহারী রকমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নোট বই। বিভিন্ন নামে ইহা বাজারজাত হইয়াছে। গ্যারান্টি গাইড, কনসেন্ট, টেকনিক, কমন হ্যান্ডনোট ইত্যাদি বাহারী নামে এইগুলি নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছিয়াছে।

গোয়েন্দা পুলিশ ২৫ এপ্রিল মঙ্গলবার বরিশাল শহরের লাইন রোডের ষ্টার লাইব্রেরীতে হানা দিয়া ১৮৪ খানা এই ধরনের গাইড উদ্ধার ও বিক্রেতা রফিককে গ্রেফতার করে। প্রতিটি গাইডের সাইজ হইতেছে দৈর্ঘ্যে ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৩ ইঞ্চি [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ২০০০]। বস্তুতঃ বরিশালের পুলিশের মতো এমন তৎপরতার অভাবেই প্রতিবছর সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়তো ভাবতেই পারে না, এভাবে দেশের ভেতরে অসাধু একটা বড় ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

আবার সংবাদপত্র নকলে ব্যবহৃত গাইড বই, নোট বইয়ের সমালোচনা করলেও এসব গাইডবই, নোট বইয়ের বিজ্ঞাপন তারাই প্রকাশ করে ছাত্রদের সামনে পরিচিত করে দেয়। এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র যুক্তি তুলতে পারে যে, টাকার জন্যে তারা বিজ্ঞাপন ছেপে থাকেন। টাকাই যদি ব্যাপার হয়,তাহলে টাকার জন্যেই যেসব দুর্নীতি দেশে হয় তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের দাঁড়ানোর নৈতিক জোর থাকে কোথায়! দেশের সরকার নিয়ন্ত্রনাধীণ ইলেকট্রোনিক মিডিয়া বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগই রয়েছে। কিন্তু টাকা দিয়ে কেউ বাংলাদেশ টেলিভিশনে সিগারেটের বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন না। কিন্তু সিগারেটের চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতির শিক্ষা বিনাশী গাইড বই, নোট বইয়ের বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রে তা, টাকা দিয়ে ছাপানো সম্ভব হচ্ছে। সংবাপত্র হয়তো কোনদিনই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যে, তারা পরীক্ষায় নকলের সরঞ্জাম গাইডবই, নোটবইয়ের বিজ্ঞাপন ছাপবে না।

এসব গাইড বই, নোট বইয়ের বিজ্ঞাপনের দু'একটি নমুনাও এ প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে ঃ

প্রশ্নপত্র ফাঁস
ইংরেজি দুই পেপার

SSC-2001
SSC-2001 প্রশ্নপত্র ফাঁস!!

কেমন হতো যদি পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র পাওয়া যেত অথচ তা বে-আইনী না হতো। তাহলে তো আতে চাঁদ পাওয়া যেত, নয় কি? কর্তৃপক্ষ Communicative Syllabus -এর মানবন্টনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন। সেই আলোকে পুরা ২০০ Cover নম্বর করে বের হয়েছে **Model Test Best Quality Sample Questions & Answers** by-Sekendar Ali প্রথম পত্রের পাঠ্য (Textbook)বই -এর সবগুলো Lesson থেকেই Comprehenison-এর প্রশ্ন করা হয়েছে। সর্বশেষ Model অনুসারে প্রশ্নগুলিকে সাজানো হয়েছে। বইটি সংগ্রহ করুন। কিছুই আর গোপন নেই।

প্রাপ্তিস্থান আল-হেলাল পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনটি সংগ্রহ করা হয়েছে দৈনিক মানবজমিন এবং যুগান্তর-এর ৯ মে ২০০০ সংখ্যা থেকে। এই বিজ্ঞাপনটি শুধু দৈনিক যুগান্তর ও মানবজমিনেই নয়, প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার প্রায় সকল জাতীয় দৈনিকেই। এ সময় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও চলছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে দেশে পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে না। প্রতি বছরই প্রশ্নপত্র ফাঁস হতো একথা এখন জনগণ ভুলেও গিয়েছে। সেই 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' শিরোনাম করে উল্লাসের সঙ্গে বিজ্ঞাপন আবার পরীক্ষা চলাকালীন কতোটা ভয়াবহ ও অপরাধের তা নিরূপণ করাও কঠিন। বোঝা যায়, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ন্যূনতম ethics-ও মেনে চলা হচ্ছে না।

আরো দু'টি বিজ্ঞাপন-চিত্র দেখা যেতে পারে ঃ

১.

পপি লাইব্রেরী! পপি লাইব্রেরী!!

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, তোমরা অবগত আছো যে, ২০০১ সালের এস. এস. সি ইংরেজি পরীক্ষা নতুন সিলেবাস তথা Communicative System-এ হতে যাচ্ছে। এই System-এ কি ধরনের প্রশ্নপত্র হবে তা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই উদ্বিগ্ন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, চাহিদা ও নির্ভরতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট গবেষনা করেছি। নতুন সিলেবাস, মানবন্টন ও প্রশ্নপত্রের ধারার আলোকে আমাদের এ গবষণার সোনালী ফসল পপি English গাইড (প্রথম পত্র দ্বিতীয়) আগামী ২৪-৬-২০০০ইং রোজ শনিবার বের হতে যাচ্ছে। বাইটি ছাত্র/ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমরা আশাবাদী।

-ব্যবস্থাপক

২.

পপি লাইব্রেরী! পপি লাইব্রেরী!!

লেখক ও সম্পাদক আবশ্যক

স্বনামধ্যন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পপি লাইব্রেরীর প্রকাশনা শাখার জন্য মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা কাজে কিছু সংখ্যক যোগ্য ও মেধাবী লোক (ফুল টাইম/পার্ট টাইম) নিয়োগ করা হবে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তিধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও স্বহস্তে লিখিত দরখাস্তসহ নিম্ন ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করতে বলা যাচ্ছে।

ব্যবস্থাপক
পপি লাইব্রেরী
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন ঃ ৭১২২০৭৩ (অফিস),
৭১১৪৩৫৮

উপরোক্ত দু'টির প্রথমটি 'যুগান্তর' ২০ জুন ২০০০ এবং দ্বিতীয়টি দৈনিক ইত্তেফাক-এর ২১জুন ২০০০ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

পরীক্ষার সময় এই পপির গাইডের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রগুলো ছিল সোচ্চার, এদের নানারকম গাইড পরীক্ষায় নকলের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। অথচ সংবাদপত্র এদের বিজ্ঞাপন টাকার বিনিময়ে ছেপেছে, তাহলে এদের বিরুদ্ধে লেখার নৈতিক শক্তি সংবাদপত্রের থাকে কোথায়! সংবাদপত্রগুলোর কি কোনই দায়িত্ব নেই!

নকলের বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংবাদপত্রের 'সৃজনশীলতা' আবিষ্কার

নকলবাজ ছাত্ররা পরীক্ষায় নকলের জন্যে নোটবই, গাইড বইয়ের বাইরেও নানারকম পদ্ধতি ও উপাদান ব্যবহার করে থাকে। হাতের মধ্যে লিখে আনা থেকে শুরু করে বেঞ্চে, কাগজে ইত্যাদি নানারকমভাবে নকলের কাজে ব্যবহার করে থাকে। কোন কোন সংবাদপত্র এসব অপকর্মের পদ্ধতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে উঁচু মানের সৃজনশীলতা। একটি দৈনিক 'নকল: বিচিত্র সব পদ্ধতি'

শীর্ষক শিরোনামে লিখেছে ঃ এইচএসসি পরীক্ষায় নকল চলছে বিচিত্র সব পদ্ধতিতে। এসব পদ্ধতি কৌতুকপ্রদ হলেও সৃজনশীলতার দিক থেকে উঁচু মানের। [যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

নকলের খবর প্রকাশে সংবাদপত্রের আন্তঃদ্বন্দ্ব

সারাদেশে পরীক্ষায় নকলের খবর প্রকাশ ও প্রচারে সংবাদপত্রের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায়। কে কত বেশী সংখ্যক কেন্দ্রের নকলের খবর প্রকাশ করতে পারে, কত বড় হেডিং দিয়ে তার শিরোনাম করবে। তার একটি সুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকল সময়ই চলে। কোন কোন সংবাদপত্র কোন কেন্দ্রে নকল না হলেও নকল বিরোধী এ্যাকশনকেই এমন শিরোনাম করে তোলে যে, মনে হয় কেন্দ্রটি নকলবাজদের নিয়ন্ত্রণেই চলে গেছে। কোন কোন সংবাদপত্রের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমন করার উদ্দেশ্যেও নকলের খবর প্রচারের অতি উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। ফলে নকলের প্রকৃত চিত্রের সঙ্গে সংবাদত্রের প্রকাশিত চিত্রের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে। যেমন,

১. মুক্তকণ্ঠ, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, বাংলাবাজার পত্রিকা, দৈনিক মানবজমিন প্রভৃতি সংবাদপত্র পয়লা মে ২০০০ এই খবর প্রকাশ করে যে,সারাদেশে পূর্বের তুলনায় নকল প্রবণতা কমে এসেছে। নকল প্রবণতা কমে যাওয়ায় অপ্রীতিকর ঘটনাও কম ঘটেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করায় ব্যাপক হারে নকল কমেছে। দৈনিক ইত্তেফাকও ৪ মে এবং ৮ মে খুলনা ও শেরপুরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর চিত্র তুলে ধরে বলে 'নকলের ভূস্বর্গ' বলে পরিচিত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এমন সুন্দর পরিবেশে আর কোন সময় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ ১৬মে ২০০০বলে, আসন বিনিময় ব্যবস্থা ঢাকা ও যশোর বোর্ডে পূর্ণাঙ্গ এবং চট্টগ্রামে আংশিকভাবে কার্যকর করা সফল হওয়ায় ছাত্রদের মাঝে নকল করার প্রবণতা ও সুযোগ কমে গেছে। কিন্তু যুগান্তর এবং দৈনিক ইনকিলাব পরীক্ষার প্রথমদিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত দাবী করে

এসেছে নকলে দেশ ভেসে গেছে। ৭মে ২০০০তারিখে যুগান্তর লেখে, 'নকল এবার আগের চেয়ে কমেনি বরং বেড়েছে'। দৈনিক ইনকিলাবও অনুরূপ মন্তব্য করে ৩মে ২০০০ তারিখে পত্রিকাটি লেখে, দেশ জুড়ে পরীক্ষায় নকলের মহামারী কর্তৃপক্ষ সামান্যতমও রোধ করতে পারেনি।

২. পাবলিক পরীক্ষায় ব্যাপক নকল ও দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রশ্নপত্রের ধরণ পাল্টানোর দাবী ছিল দীর্ঘ দিনের। সংবাদপত্রগুলো দীর্ঘদিন থেকেই এনিয়ে প্রচুর নিবন্ধ, মতামত ও খবর প্রকাশ করে আসছিল। পরীক্ষা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদরা বলেছিলেন, এমন প্রশ্নপত্রই করা উচিৎ যাতে লেখাপড়া করা না থাকলে বই খুলে নকল করার সুযোগ থাকলেও প্রকৃত উত্তর লিখতে ব্যর্থ হয়।

১৯৯৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের সভাপতিত্বে শিক্ষাবোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী পরীক্ষাগুলাতে প্রশ্নপত্রের ধরণ হবে বিশ্লেষণাত্বক এবং গণিতের প্রশ্নে সংখ্যা বা ডিজিট পরিবর্তন করে দেওয়া হবে যাতে লেখাপড়া যারা করে তারাই পরীক্ষায় পাশ করতে পারে। [এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, মুক্তকণ্ঠ, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯]।

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ থেকে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, সমস্ত স্কুল-কলেজে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কর্মশালা করে প্রশ্নকর্তাদেরও গতানুগতিক প্রশ্ন না করে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশ্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সংবাদ-এর ৪মে ২০০০ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে একটি লেখা প্রকাশিত হয়, যেখানে দাবী করা হয়, পরীক্ষা প্রশ্নপত্র নতুন আঙ্গিকে করার কথা ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন আঙ্গিকে প্রশ্নপত্র করা হয়েছিল কিনা তার উত্তর পাওয়া যায় যুগান্তর ১২ জুন ২০০০ সংখ্যার অভিযোগের মধ্যেই। এদিন 'যে কারণে এত ফেল' শিরোনামে 'যুগান্তর' পত্রিকা বিভিন্ন জনের মত প্রকাশের সূত্রে সংবাদপত্রটি

নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, নতুন সিলেবাস নতুন ধারার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীরা বুঝে উঠতে পারেনি। প্রশ্নে অঙ্কের ডিজিট পরিবর্তন করে দেয়াই ফেল করার প্রধান কারণ। [যুগান্তর, ১২ জুন ২০০০]

কেন সংবাদপত্রে নকল বিষয়ক খবরে অতিরঞ্জন

সাধারণভাবে সংবাদপত্রগুলো মনে করে দুর্নীতি,ভাংচুর, গন্ডগোল,রাহাজানি, খুন,সন্ত্রাসের খবর বেশী করে থাকলে পাঠকের কাছে সংবাদপত্রের কদর বাড়ে। দেশে যদি শান্তি-শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে এবং কোন প্রকার নেতিবাচক খবর না থাকে তাহলে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো খুব বেশী খবরের খড়ায় পতিত হবে, অন্তত যেভাবে সংবাদপত্রগুলো এদেশে বেড়ে উঠেছে তার ভিত্তিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক পক্ষ রয়েছে। বাংলাদেশের এমন একটি সংবাদপত্র নেই, যার নিজস্ব কোন রাজনৈতিক লাইন নেই। ফলে প্রতিটি সংবাদপত্র সংবাদ চয়নে নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে 'ট্রিটমেন্ট' করে থাকে এবং সেভাবেই তার প্রতিপক্ষের নেতিবাচক দিকগুলো আরো অতিরঞ্জন করেই প্রকাশ করে থাকে। সংবাদপত্রগুলোর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ও রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দের মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তি বিশেষকে সমাজে হেয় এবং ব্যর্থ বলে পরিচিত করে তুলতেও অনেক সময় সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ নিজ প্রতিবেদককে বিশেষ 'এসাইনমেন্ট' দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে-সংবাদপত্রের জন্যে এটা কোন খবর নয়। পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি (না থাকলেও) কোন সংবাদপত্র উৎসাহ ভরে লিখে দিয়েছেন 'পরীক্ষা পদ্ধতি শেষ হয়ে গেল'। ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অন্যান্য বারের তুলনায় জনমত এবং প্রতিরোধ নকলের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাজে দেওয়ায় নকল কমে এসেছিল। দু'একটি সংবাদপত্র মনে করেছেন সত্য মেনে নিলে তাদের নৈতিক পরাজয় ঘটবে। ফলে প্রায় সকল জাতীয় সংবাদপত্রে নকল প্রবণতা কমে আসার খবর

প্রকাশিত হলেও যুগান্তর এবং দৈনিক ইনকিলাব তার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে।

সংবাদপত্রের পাতায় সুপারিশমালা

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে সংবাদপত্রের পাতায় বিভিন্ন সূত্রে, নিবন্ধে সাক্ষাৎকারে, নানারকম সুপারিশই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু সুপারিশ বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, কিছু অবাস্তব এবং কৌতুককর সুপরিশও রয়েছে ঃ

১. পাবলিক পরীক্ষায় ইংরেজী পত্রের পরীক্ষা সকল বিষয়ের শেষে অনুষ্ঠিত হলে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকবে। [সংবাদ, ৯মে ২০০০]

২. নকল বন্ধ করার জন্যে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা ভর্তির পূর্বানুমতি বন্ধ করে দিতে হবে। [প্রথম আলো, ১০মে ২০০০]

৩. নকলকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে মিডিয়াকে বাহুল্যতা বর্জন করতে হবে। নকলের 'মহোৎসব' সর্বাংশে সঠিক নয়। [দৈনিক মানব জমিন, ২৯ এপ্রিল ২০০০]

৪. পরীক্ষায় নকল বিরোধী আইনগুলোর প্রয়োগ জরুরী হয়ে পড়েছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৫. স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও প্রশাসনিক দুর্বলতাই নকলের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দুর্বলতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৬. পরীক্ষা কেন্দ্রে রাজনৈতিক প্রভাব কমালেই নকলমুক্ত পরিবেশ সম্ভব। [প্রথম আলো, পয়লা মে ২০০০]

৭. শিক্ষকদের পেশাগত দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই, তা আনতে হবে। [সংবাদ,৩মে ২০০০]

৮. সাহসী এবং নীতিবান শিক্ষককে আগে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। [দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩মে ২০০০]

৯. আসন বিনিময় ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৪মে ২০০০, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ এপ্রিল, ১৬ মে ২০০০]

১০. নকল সরবরাহকারী এবং সহায়তাকারী শিক্ষকদের শাস্তি কার্যকর করা প্রয়োজন। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৫মে ২০০০]

১১. পরীক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। [দৈনিক সংগ্রাম, ৬মে ২০০০]

১২. মাদ্রাসা পরীক্ষায় মনিটরিং ও ভিজিল্যান্স আরো বাড়ানো প্রয়োজন [দৈনিক ইত্তেফাক, ৭মে ২০০০]।

১৩. নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া যাবে না [যুগান্তর, ৭মে ২০০০]।

১৪. শিক্ষক-ছাত্রদের নিয়মিত ক্লাশ করা নিশ্চিত করতে হবে। [যুগান্তর, ৭মে ২০০০]

১৫. অবসরপ্রাপ্ত এবং অবসরগ্রহণ ছুটিরত শিক্ষকদের দিয়ে পরীক্ষায় আরো ভিজিল্যান্স টিম গঠন কার্যকর করা প্রয়োজন। [দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭মে ২০০০]

১৬. পাবলিক পরীক্ষার সময় স্থানীয় রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাদের জেলে রাখলে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৮মে ২০০০]

১৭. বহিরাগত নকল সরবরাহকারীদের চিহ্নিত করে মামলা দায়েরের জন্য ওদের ভিডিও ক্যামেরা বন্দী করে রাখা প্রয়োজন। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৮মে ২০০০]

পরীক্ষার ফলাফল ও মূল্যায়ন

২০০০ সালের ২৬ আগষ্ট শনিবার একযোগে দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। সংশ্লিষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ ২৫ আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এই ফলাফল তুলে দেন।

২০০০ সালের এপ্রিল-মে মাসে সারা দেশে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ৫ লাখ ২ হাজার ৯২৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে পাস করে ১ লাখ ৮৬ হাজার ২৩৪ জন এবং সারা দেশের গড় পাসের হার ছিল ৩৭ দশকি ০৩ ভাগ। ১৯৯৯ সালে সারা দেশের গড় পাসের হার ছিল ৫৩ দশমিক ৪০ ভাগ।

২০০০ সালে সর্বোচ্চ পাসের হার কুমিল্লা বোর্ডে ছিল ৪০ দশমিক ৩৮ ভাগ, আর সর্বনিম্ন ঢাকা বোর্ডে ৩৫ দশমিক ৩৮ ভাগ। যথারীতি ২০০০ সালেও মেয়েদের দ্বিগুণ ছেলে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তবে অংশগ্রহণে পিছিয়ে থাকলেও পাসের হারে এগিয়ে ছিল মেয়েরাই। ২০০০ সালে মোট ৩ লাখ ১৫ হাজার ৪৫ জন ছেলে পরীক্ষায় অংশ নেয়, এদের মধ্যে পাস করে ১ লাখ ১০ হাজার ২৮৯ জন। ছেলেদের গড় পাসেরহার ৩৫ ভাগ। অন্যদিকে ১ লাভ ৮৭ হাজার ৮৯১ জন মেয়ে অংশ নিয়ে পাস করে ৭৫ হাজার ৯৪৫ জন। মেয়েদের গড় পাসের হার ৪০ দশমিক ৪২ ভাগ।

২০০০সালের এসএসসি পরীক্ষায় সারা দেশে তিন বিভাগে মেয়েরা শীর্ষস্থান অধিকার করলেও এইচএসসিতে শীর্ষ তিনজনই ছেলে এবং শীর্ষ তিনজনই যশোর বোর্ডের। বিজ্ঞান বিভাগে সারা দেশে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিল বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক, তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৯৫৯। আর মানবিকে সারাদেশে সবচেয়ে বেশি ৯৩৩ নম্বর পায় ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মীর নাহিদ মাহমুদ। বাণিজ্যে ৯০৪ নম্বর পেয়ে সবার শীর্ষে ছিল মোহাম্মদ কুদরতউল্লাহ। সে বরিশাল অমৃতলাল দে কলেজের ছাত্র।

পাসের হারে এগিয়ে থাকলেও মেয়েরা ২০০০ সালের এইচএসসি -তে মেধা তালিকায় বেশ পিছিয়ে। তিন বিভাগে ৫ বোর্ডর মোট ১৫টি সম্মিলিত মেধা তালিকায় মাত্র তিনটির শুরুতে ছিল মেয়েদের নাম। ৮৭৭ নম্বর পেয়ে ঢাকা বোর্ডে মানবিক বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের ছাত্রী জুরানা আজিজ ৮১৩ নম্বর পেয়ে চট্টগ্রাম বোর্ডে মানবিক বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম চট্টগ্রাম কলেজের নিশাত সুলতানা ৮৩২ নম্বর নিয়ে চট্টগ্রাম বোর্ডেরই বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা

তালিকায় সবাইকে ছাড়িয়েছিল ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের মাহবুবুল লিমা।

বিপর্যয়ের বড়ো কারণ যত্ন নিয়ে পাঠদান না করা

এইচএসসি পরীক্ষায় ৩ লাখেরও বেশি পরীক্ষার্থী পাস না করায় শিক্ষকরা নিজেদেরই দায়ী করেছেন। এ বিষয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন (ভোরের কাগজ-এর ২৮ আগষ্ট ২০০০ তারিখে) প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়ঃ

কলেজে আগের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের যত্ন নিয়ে পাঠদান করা হয় না। পাশাপাশি শিক্ষকরা ফল বিপর্যয়ের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকাও অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অধিকাংশ কলেজে পড়াশোনার পরিবর্তে ছাত্রভর্তি আর পরীক্ষার ফরম পূরনের ব্যবসা করা হয় বলেও শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন। রাজধানী ঢাকার কয়েকটি কলেজের বেশ কজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললে তারা এইচএসসির ফল বিপর্যয় সম্পর্কে এই অভিমত দেন।... এতো অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ফেল কারা সংবাদে গতকাল (২৭ আগষ্ট) সারা দেশে এইচএসসি পরীক্ষার্থী এবং কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। অভিভাবক মহলও শঙ্কিত। শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা হোসনে আরা শাহেদ মনে করেন, ক্লাসে পড়াশেনা হয় না বলেই ছাত্র-ছাত্রীরা ফেল করছে। তিনি এ জন্য শিক্ষকদের দীয় করে বলেন, দুর্বল প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে ক্লাসে যত্ন নিয়ে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট আর কোচিং নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন তারা। কলেজগুলোর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কলেজগুলো এখন পোস্ট অফিসে পরিণত হয়েছে। যেখানে আসলে সহজেই পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার রেজিষ্ট্রেশন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে আসার চেয়ে তাই বাড়ীর কাছে কোচিং-এ যেতে বেশি আগ্রহী।

খিলগাঁও মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ বদিউজ্জামানও একই অভিযোগ তুলে বলেন, পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য শ্রেণীকক্ষে শতকরা ৭৫ ভাগ উপস্থিত থাকার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তা কোথাও মেনে চলা হয় না। তিনি এ জন্য বর্তমান আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে দায়ি করে বলেন, ছাত্র

ছাত্রীদের অনুকূলে এখন কিছুই নেই। তবে সবকিছুর পরও তিনি শিক্ষকদের দোষ দিয়ে বলেছেন, শিক্ষার্থীকে তৈরি করার দায়িত্ব একজন শিক্ষকের এবং সেখানেই শিক্ষকরা চরমভাবে ব্যর্থ।

সিদ্ধেশ্বরী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ শামসে আরা মনে করেন, নতুন সিলেবাস হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা এবার বাছাই করে পড়াশোনার সুযোগ কম পেয়েছে। কারণ তাদের সামনে আগের বছরের প্রশ্ন বাদ দেওয়ার কিছু ছিল না। এ ছাড়া প্রশ্নপ্রত্রের ধরণ পাল্টে যাওয়ায়ও তারা অসুবিধায় পড়েছে। ৩ লাখ পরীক্ষার্থী ফেল করার জন্য শিক্ষকদের দায়ী করে তিনি বলেন, যত্ন নিয়ে শিক্ষকরা ক্লাস নিলে এমন বিপর্যয় হতো না। শিক্ষকরা কলেজে পড়াশোনা উন্নত করার জন্য কলেজ প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, ক্লাসে যাতে শিক্ষকরা যত্ন নিয়ে পড়ান এবং ছাত্র ছাত্রীরাও যাতে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হয় সেদিকটা কলেজ প্রশাসনকে দেখতে হবে। পাশাপাশি সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের। [ভোরের কাগজ, ২৮ আগষ্ট ২০০০]।

ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক, তবে উপায়ও ছিল না

দৈনিক মাবন জমিন এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় লিখে মন্তব্য করে বলেনঃ

...ফলাফল নিয়ে একটা আশঙ্কা শুরু থেকেই ছিল। যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় এই ফলাফলকে বিপর্যয় বলা যায় কিন্তু পরীক্ষাগুলো যে পরিস্থিতিতে হয়েছে তাতে এমন ফলাফলই বাঞ্চনীয়। নকল করলেই যে পাস করা যায় না-এটা ছাত্র ছাত্রীরা এবার বুঝতে পারবে নিশ্চয়। ফলাফল যদিও হতাশাব্যঞ্জক কিন্তু এছাড়া তো উপায় ছিল না।

একটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ জরুরী ঃ শহরের মুষ্টিমেয় স্কুল, কলেজ ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো এবং মফস্বলের কলেজগুলোর ফলাফল খুবই খারাপ। এটা মেনে নেয়া যাচ্ছে না। শুধু শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে দোষ চাপানো ঠিক নয়, কলেজগুলোতে নিয়মিত ক্লাস হয় না। যথাসময়ে সিলেবাস শেষ হয় না, বিশেষ করে ছাত্ররা দলীয় রাজনীতির প্রতি অত্যধিক ঝুঁকে পড়েছে মফস্বলের

কলেজগুলোতে। সেই সাথে এক শ্রেণীর শিক্ষক দলীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের ইন্ধন যোগাচ্ছে এবং শিক্ষকরাও রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত। পড়াশেনার চেয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড বেশি হচ্ছে কলেজগুলোতে, এর সাথে আছে প্রাইভেট কোচিং দেবার প্রবণতা। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে ক্লাস নেবার চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করেন বাসায় পড়াতে। যারা প্রাইভেট কোচিং নেবার সুযোগ পায় না তাদের জন্য সমস্যা হয় একটু অন্য কারণে। এবার নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। এই পদ্ধতিটি অনেক ছাত্রছাত্রীই বুঝতে পারেনি। শিক্ষকদের দায়িত্ব ছিল সেটা বুঝিয়ে দেয়া। অমরা এটাকে বিপর্যয় বলব না, আমরা বলবো সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভয়াবহ চিত্র এটি। এই ফলাফল আগামীতে সচেতন করবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী অভিভাববক সবাইকে [দৈনিক মাবন জমিন, ২৮ আগষ্ট ২০০০]।

এ বিপর্যয়ের প্রয়োজন ছিল

দৈনিক ইত্তেফাকও এ সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়ঃ

এসএসসি'র মত এইচএসসি পরীক্ষান্তেও ফল বিপর্যয় ঘটায় বিভিন্ন মহলের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় পাসের গড় হার ছিল ৪০ দশমিক ৩৬। এইচএসসিতে পাসের গড় হার দাড়াইয়াছে ৩৭ দশমিক ০৩। অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষায় শতকরা ৬০জন এবং এইচএসসি পরীক্ষায় শতকরা ৬৩জন ছাত্র-ছাত্রী ফেল করিয়াছে। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছে কেন এই বিপর্যয়? একটানা ১০ বছর অথবা ১২ বছর পড়াশুনা করিয়া বোর্ডের পরীক্ষায় যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী ফেল করে তাহা হইলে দেশে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কি? শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, দেশের বিভিন্ন স্থানে গুটিকয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঠিকমত লেখাপড়া হয় কিনা, তাহার জবাবদিহিতাও নাই। উপরন্তু এইবার পরীক্ষায় নকলের সুযোগ কমিয়া যাওয়ায় ফল বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তিনি বলেন, পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় মানেই জাতীয় সম্পদের অপচয়। দেশের স্বার্থেই

এ অপচয় কখনই কাম্য হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস এবারের বিপর্যয় শিক্ষার মান উন্নয়নে ভবিষ্যতে ভূমিকা রাখিবে। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার প্রতি আগ্রহী হইবে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবীদরাও একই মন্তব্য করিয়াছেন।

...এত স্বল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করার কারণে প্রতিষ্ঠানের পড়াশুনার মান, লেখাপড়ার পরিবেশ, সর্বোপরি শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান দুরবস্থার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। সূত্রগুলির মতে, দেশের শহর এলাকার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী লেখাপড়া হয় না। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমন্বিত ব্যবস্থা নাই।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনেকেই শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানে তেমন পারদর্শী নন। নোট বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইলেও স্কুল-কলেজ মাদ্রাসার অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেরাই নোট বই পড়িয়া শ্রেণীকক্ষে পাঠ দান করেন। প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মিছিল-মিটিং করিয়া সময় কাটানোর প্রবণতা বেশী। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের কারণে কখনও কখনও শিক্ষক, ছাত্র নেতা কোন ঘোষণা ছাড়াই নির্ধারিত ক্লাসে হাজির থাকে না।

অন্যদিকে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একদল ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত ক্লাস করার চাইতে নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে মিছিল-মিটিংয়ের কাজে বেশী ব্যস্ত থাকে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত টেস্ট-প্রিটেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ক্লাসে হাজিরার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রহিয়াছে। অধিকাংশ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ক্লাসে হাজিরার বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। অনেকে সারা বছর ক্লাসে অনুপস্থিত থাকিয়াও বোর্ডের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পান। কোথাও কোথাও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় নকলের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধ্বস নামিয়াছে।... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর একে অজাদ চৌধুরী বলিয়াছেন, এই বিপর্যয়ের প্রয়োজন ছিল। এখন নিশ্চয়ই ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝিতে পারিয়াছে পড়াশুনার কোন বিকল্প নাই। না পড়িলে পরীক্ষায় পাস করা

যাইবে না। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর এটিএম শরীফউল্লাহ বলেন, শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত লেখাপড়া হয় নাই বলিয়া এসএসসি ও এইচএসসিতে ফল বিপর্যয়। আমাদেরকে শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতন করিয়া তুলিবে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব প্রফেসর কাজী ফারুক বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জবাবদিহিতার পরিবেশ নিশ্চিত না হইলে এই ধরণের বিপর্যয় রোধ করা যাইবে না। শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের আন্তরিকতার পাশাপাশি সরকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতাও তিনি কামনা করেন।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, ২৩শে আগষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সহিত শিক্ষামন্ত্রীর যৌথ বৈঠকে যে সমঝোতা স্মারক প্রস্তুত করা হইয়াছে উহার প্রতিটি দফা কার্যকর হইলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে। সমঝোতা স্মারকের সিদ্ধান্তসমূহ যথাক্রমেঃ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র-ছাত্রী থাকিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীর হ্রাস পাইলে আনুপাতিক হারে এমপিওভুক্ত শিক্ষক হ্রাস পাইবে। প্রত্যেক শিক্ষক নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত পিরিয়ড/ক্লাস (টিউটোরিয়ালসহ) নিবেন। স্বীকৃতি প্রাপ্তির নীতিমালা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও পাসের হার নিশ্চিত করিতে হইবে। ২০০৪ সালের মধ্যে অগ্রগতির হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। নকলমুক্ত অবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষক সমাজ সচেষ্ট থাকিবেন। কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক পরীক্ষায় নকলে সহায়তা করিলে সংশ্লিষ্ঠ শিক্ষকের বেতনের সরকারী অংশ বন্ধ করা হইবে এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রে নকল হইবে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা হইবে। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন বিশেষ কমিটি থাকিবে না। নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত কোন প্রার্থী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হইবে না [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ আগষ্ট ২০০০]।

কলেজ শিক্ষকদের মূল্যায়ন

ব্যাপক হারে ছাত্র-ছাত্রীদের ফেলের লজ্জা গোটা শিক্ষক সমাজের। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বিপর্যয় শীর্ষক এক মুক্ত আলোচনায় (২৯ আগষ্ট ২০০০

তারিখে) শিক্ষকগণই বলেন, ব্যাপকহারে ছাত্রছাত্রীদের ফেলের লজ্জা গোটা শিক্ষক সমাজের। তারা বলেন, নতুন সিলেবাসের জন্য ছাত্রছাত্রীরা পাশ করেনি, এটি কোন যুক্তি হতে পারে না। মূলত বেশির ভাগ শিক্ষকই ক্লাসে ঠিকমতো পড়ান না। অন্যদিকে আলোচনায় শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, বর্তমানে প্রাইভেট না পড়লে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকরা নজর দেন না।

ঢাকায় বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এই মুক্ত আলোচনায় এক প্রস্তাবে বলা হয় ঃ

দুটি শর্ত পূরণ হলে আগামী বছর পরীক্ষার ফেলের এই চেহারা থাকবেনা। এই শর্তগুলো হলো, ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৭৬ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় শুধু যারা নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদেরই অংশ নেওয়ার অনুমিত দিতে হবে প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এ দুটি শর্ত মেনে চলার জন্য বোর্ডের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তা মেনে চলে না। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ। তিনি বলেন, 'আমরা বিবেকের দংশনে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি। এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের দায়বদ্ধতা আমরা এড়াতে পারি না'। শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন না। প্রি-টেষ্ট ও টেষ্ট পরীক্ষার প্রচলন থাকলেও কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কার্যত তা মেনে চলা হয় না। ঢালাওভাবে ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়াকেই ফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রবন্ধে বলা হয়, শিক্ষক সমাজে অসততা ঢুকে যাওয়ার কারণে এমনটা ঘটছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষা হোসনে আরা বেগম বলেন, যখন অভিযোগ শুনি প্রাইভেট পড়ানোর জন্য শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাসে পড়ান না, তখন লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। সিলেবাস পরিবর্তনের কারণে ফল খারাপ হয়েছে, এ যুক্তি দেওয়া ঠিক নয়। কলেজে আসার পর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যে কোন সিলেবাসই থাকে নতুন। দুই বছর ঠিকমতো ক্লাস পরীক্ষা নেওয়া হলে যে কোন বিষয়ে ধারণা পাওয়া সম্ভব। শিক্ষকগণ নিজেরাই সিলেবাস বোঝেননি, এমন প্রশ্নও হয়তো এখন উঠবে। [ভোরের কাগজ, ৩০ আগষ্ট ২০০০]

গাইড বই, নোট বই প্রকাশকদের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় অসুদপায়ের দিনগুলো হয়তো ভালভাবেই

ফুরিয়ে আসছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র এ বিষয়ে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালন করেছে। এ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও সরাসরি অবদান ছিল। ১৯৯৮ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকার প্রধান প্রধান দৈনিকগুলোর সংবাদদাতাদের সমন্বয়ে ভিলিল্যান্স টিম গঠন করে ঢাকা শহর ও অন্যান্য জেলায় পরীক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছিল। এর ফলে সংবাদপত্রে পরীক্ষায় নকল নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়, যা এর আগে কখনো ঘটেনি। বিশেষ করে পরীক্ষায় শিক্ষক, অভিভাবক, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য এমনকি স্থানীয় সংবাদিকদের অসৎ ভূমিকাও সংবাদপত্রে উন্মোচিত হয়। এর ফলে সারাদেশে একটি বড় ধরণের জনমত সৃষ্টি হয়।

উপসংহার

ভবিষ্যতে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, প্রশাসন, সংবাদপত্র সেবী ও আপামর জনসাধারণ শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার অনুকূলে নিজেদের ভূমিকা সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে সক্ষম হলে এ প্রবন্ধ লেখা স্বার্থক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্য নির্দেশিকা

বাংলাদেশে প্রকাশিত (২০০০ সালের) বিভিন্ন তারিখের দৈনিক পত্রিকাসমূহ।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
১।	অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ, ১৯৬৪	– ডব্লিউ, ডব্লিউ রসটো	টাঃ ৬.৫০/-
২।	প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি ১৯৭০	যাহিদ হোসেন -সম্পাদনায়	টাঃ ৬.৫০/-
৩।	প্রশাসনের মূলনীতি ১৯৭১	যাহিদ হোসেন -সম্পাদনায়	টাঃ ১৮/-
৪।	প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতাঃ স্মৃতিচারণ ১৯৮৪	নীলুফার বেগম-সম্পাদনায়	টাঃ ১৮/-
৫।	সরকারী কর্মচারী মহিলা নির্বাহী বিকাশের সমস্যা ১৯৮৭	নীলুফার বেগম	টাঃ ৬.৫০/-
৬।	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা ১৯৮৮	এ, কে, এম হেদায়েতুল হক ও হীরালাল বালা	টাঃ ১২০/-
৭।	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ১৯৯৪	নাসিরউদ্দীন আহমেদ ও আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান, সম্পাদক	টাঃ ১২৫/-
৮।	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা পঞ্চম বর্ষ সংখ্যা, নভেম্বর	বণিক গৌর সুন্দর	টাঃ ৪০/-
৯।	Bangladesh Journal of Public Administration Volume VII Number 1 & II	ড. মীর ওবায়দুর রহমান সম্পাদক	টাঃ ৪০/-
১০।	লোক-প্রশাসন সাময়িকী সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০	মোঃ শফিকুল হক-সম্পাদক	টাঃ ১৫/-
১১।	The Deputy Commissoner in East Pakistan 1964	A. M. A. Muhith	টাঃ ১৬/-
১২।	Administration Policy of the Government of Bengal, 1965	Rokeya Rahman Kabeer	টাঃ ৩০/-
১৩।	Bengal Dist. Administration Committee, 1966 - Govt. of Bengal	Publish by NIPA	টাঃ ৩৫/-
১৪।	Famine Manual, 1967 - Govt. of Bengal	Publish by NIPA	টাঃ ৭/-
১৫।	Problems of Municipal Administration, 1968	M. A. Hussain Khan	টাঃ ৩৫/-
১৬।	Our Cities and Towns, 1970	Md. Jainul Abdin Ed.	টাঃ ২৩/-
১৭।	Administration reforms in Pakistan, 1970	A. N. Shamsul Hoque	টাঃ ৩০/-
১৮।	Social and Administrative Research in Bangladesh, 1973	Naj Nor Begam	টাঃ ১৬/-
১৯।	Social Change and Development in South Asia 1978	Lutful Haq Chowdhury	টাঃ ৪৫/-
২০।	District Administration in Bangladesh 1978	Qazi Azhar Ali	টাঃ ২২/-
২১।	Bangladesh Public Administration and Senior Civil Servants, 1984	Ali Ahmed	টাঃ ৫০/-
২২।	Post-Entry Training in Bangladesh Civil Service : The Challenge and response 1986	Published by BPATC SAVAR, Dhaka	টাঃ ৪০/-

নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
২৩।	Career Planning in Bangladesh, 1986	Published by BPATC SAVAR, Dhaka	টাঃ ১২০/-
২৪।	Sustainability of Project for Higher Agriculture Education, 1988 & Others	A. T. M. Shamsul Huda and others	টাঃ ৪০/-
২৫।	Approaches to Rural Health Care : A Case Study of Gonoshastya Kendra, 1988	A. T. M. Shamsul Huda and others	টাঃ ৪০/-
২৬।	Sustainability of Rural Development Project : A Case Study of Rural Development Project in Bangladesh 1988	Akar Ali Khan and others	টাঃ ৪০/-
২৭।	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh, 1989	A. K. M. Hedhayetul Huq and others	টাঃ ৪০/-
২৮।	Hand Book for the Magistrates, 2nd Ed.1990	Z. A. Shamsul Haq others	টাঃ ১০০/-
২৯।	A Study of the Use of Computers in Management Decision Making in the Public Sector of Bangladesh, 1991	Dr. Ekram Hassain and others A. K. M. Enamul Haque A. Z. M. Shafiqul Alam	টাঃ ৫০/-
৩০।	Administrative Science Review	Published by NIPA	টাঃ ১৫/-
৩১।	Decentralization & People's Participation in Bangladesh, 1983	Dr. Sk. Maqsood Ali M. Safiur Rahman Kshanada Moham das	টাঃ ১৫০/-
৩২।	The Revenud Administration of North Bengal, 1970	A. B. M. Mahmood	টাঃ ৩০/-
৩৩।	Hospital Administration, 1969	N. N. Chowdhury ed.	টাঃ ১৮/-
৩৪।	Survey of In-service Training Institution in East Pakistan, 1969	Syed Nuruzzaman	টাঃ ১৫/-
৩৫।	Bureaucracy in Bangladesh Perspective	A. Z. M. Shamsul Alam	টাঃ ৫০০/-
৩৬।	Limiting the Role of State Prescription of the World Bank & the Bangladesh Economy	Dr. Mir Obaidur Rahaman	টাঃ ১০০/
৩৭।	The Assessment of El Nino Impacts and Responses	Dr. Ekram Hassain and others	টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা, এটি কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্ণাল। প্রতি ইংরেজী বছরের জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে এ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। লোক প্রশাসন সাময়িকীতে কেন্দ্রের অনুষদ সস্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কর্তৃক বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় লিখিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধ এ সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

◆ প্রবন্ধটি মৌলিক বং অন্য কোন জার্ণালে বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি-এ মর্মে প্রবন্ধ জমাদেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে

◆ লেখা মান সম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মুল পাণ্ডুলিপির সংগে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ বাংলা কম্পোজ ঃ "বিজয় সুতন্নি" ফন্ট

ইংরেজী কম্পোজ ঃ "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট

◆ প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিসকেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে

◆ প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

◆ মুল কপিসহ পাণ্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্থ (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদ কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না

◆ ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

◆ প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে

◆ প্রবন্ধের পাদটিকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খন্ড ও ইসু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে

◆ লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন

◆ প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিসকেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

◆ মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।